যে অতীত প্রেরণা যোগায়- ১৩

আট শহীদের বাবা

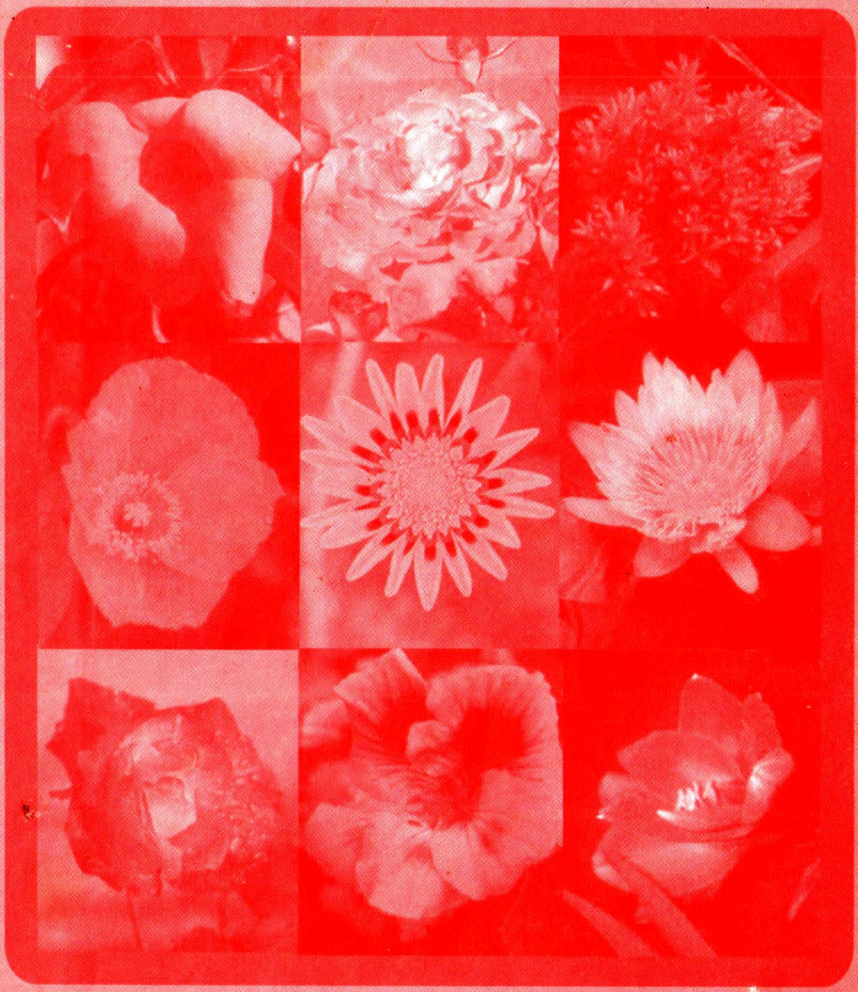

জামিল মাহমুদ

আট শহীদের বাবা

যে অতীত প্রেরণা যোগায় -১৩শ' খন্ড

সংকলন ও সম্পাদনায়
জামিল মাহমুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টার, খুলনা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
মনোয়ার হোসেন রানা
পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টার
বাড়ী নং- ৬৭, রোড নং-৬,
মুজগুন্নী আবাসিক এলাকা, খুলনা-৯০০০।
ফোনঃ ০৪১-৭৬০৮৮৫

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী- ২০০৫

মুদ্রণে
দি দেশ প্রিন্টার্স
১০, জয়চন্দ্র ঘোষ লেন প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

বিনিময়
দশ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থানঃ
ঢাকা অফিসঃ ১২৬/২, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোনঃ ৯৩৪৮২৩৮
তাসনিয়া বই বিতান, ওয়ারলেস গেট, মগবাজার, ঢাকা।
কাঁটাবন বুক কর্ণার, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা।
খন্দকার প্রকাশনী, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর অসীম দয়া ও অনুগ্রহে ইসলামী ইতিহাস বিশেষ করে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ), প্রিয়নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের জীবনের ছোট ছোট কাহিনীর সংকলন যে অতীত প্রেরণা যোগায় সিরিজের ১৩'শ খন্ড "আট শহীদের বাবা" প্রকাশিত হলো।

উহুদের প্রান্তর ইসলামের ইতিহাসের এক উর্বর স্মৃতি। এ প্রান্তরেই সাহাবীগণ (রাঃ) স্থাপন করেছিলেন শাহাদাত ও জিহাদের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জিহাদের নেশায় এ ময়দানে অপবিত্র দেহে ছুটে এসেছিলেন হযরত হানজালা (রাঃ)। দুশমনের আক্রমণে শাহাদাত বরণ করেছিলেন তিনি।

শাহাদাতবরণ কোন সাময়িক আবেগ নয়, এ কথা প্রমাণ করেছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র আবদুল্লাহ। উমাইয়্যা খলীফাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সেনাপতির পতাকা হাতে। মদীনাবাসীসহ সেদিন তাঁর সাথে ছিলেন আট ছেলে। আটটি ছেলেই শাহাদাতবরণ করেন বাবার সামনে। বাবা হানজালা আর আট ছেলের রক্তাক্ত স্মৃতি বুকে নিয়ে আবদুল্লাহও শাহাদাত বরণ করলেন। দুশমনের হাতে মদীনা ছেড়ে দিয়ে আবদুল্লাহ চলে গেলেন জান্নাতে।

সেদিনের সেই রক্তিম স্মৃতি মুসলিম উম্মাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়াই আমাদের এ প্রকাশনার উদ্দেশ্য। সম্মানিত পাঠক যদি সেই স্মৃতি থেকে প্রকৃত শিক্ষা নিতে পারেন, তাহলেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।

কোন ব্যবসা নয়, আল্লাহর দরবারে আমাদের এই মেহনতটুকু গুনাহ মাফের ওসীলা হিসেবে গণ্য হোক, এটাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচীপত্র		পৃষ্ঠা
১।	সাগর পথে মূসা (আঃ)	৫
২।	প্রতিদান	১৮
৩।	আট শহীদের বাবা	২০
৪।	অ্যাকশনে আবুবকর (রাঃ)	২২
৫।	ওয়ালজার লড়াই	৩১
৬।	অভ্যর্থনা	৩৩
৭।	হাদীসের উস্তাদ আবু সাঈদ (রাঃ)	৩৬
৮।	বৌভাত	৩৮
৯।	কূফা নগরী	৪২
১০।	ষড়যন্ত্রের জবাব	৪৭

www.pathagar.com

সাগর পথে মূসা (আঃ)

আল্লাহতায়ালার এক প্রিয়নবী ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। তিনি এসেছিলেন মিশরে। সে সময় মিশরের রাজা ছিল ফিরআউন। সে ছিল খুবই অহঙ্কারী এবং জালিম প্রকৃতির রাজা। মূসা (আঃ) এই রাজাকেই ইসলামের পথে ডাকলেন। কিন্তু ফিরআউন তো ঈমান আনলোই না, বরং তাঁকে নবী হিসেবেও অস্বীকার করে বসল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেনঃ

"আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম ফিরআউন, হামান ও কারুণের কাছে। কিন্তু তারা বলেছিলঃ এতো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।" (সূরা মুমিনঃ ২৩-২৪)

এক পর্যায়ে ফিরআউন আল্লাহর ক্ষমতাকেও চ্যালেঞ্জ করেছিল। মূসা (আঃ) যাদুর খেলার (এই সিরিজের ১ম খন্ডের ১ম কাহিনী দ্রষ্টব্য) মধ্য দিয়ে সে চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়েছিলেন। ফিরআউন স্পষ্টতই সেদিন পরাজিত হয়েছিল।

কিন্তু এ পরাজয়ের পর ফিরআউনের অনুসারীরা নতুন করে চক্রান্ত পাকাতে লাগল। তাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা আল্লাহর ইবাদাত করা, মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ করাকে নিজেদের জন্য মহাবিপদ বলে চিহ্নিত করল। মূসা (আঃ) যদি ইসলাম প্রচার করতে পারেন, তবে সাধারণ লোকেরা তো তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

তাই তারা ফিরআউনকে বললঃ আপনি কি মূসাকে ও তার অনুসারীদেরকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে বাদ দিতে দেবেন?

ফিরআউন তাদের কথায় সায় দিল। সে মূসার (আঃ) অনুসারীদের ছেলেদেরকে হত্যা করে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিকে ধ্বংস করতে চাইল। তাই সে বললঃ আমরা তাদের ছেলেদেরকে খুন করব আর তাদের মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখব; আর আমরা তো তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী।

এ ঘোষণার পর পরিস্থিতি বড় ভয়াবহ হয়ে পড়ল মূসা (আঃ)-এর জন্য। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে সান্তনা দিয়ে বললেনঃ আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, ধৈর্য ধর। দুনিয়ার মালিক তো আল্লাহই; তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে এর উত্তরাধিকারী বানাবেন আর চমৎকার পুরস্কার তো মুত্তাকীদের (মুমিনদের) জন্যই।

কিন্তু বনী ইসরাঈলের জন্য এ শাস্তি-নির্যাতন হয়ে পড়ল বড় অসহনীয় কষ্টের। তারা মূসা (আঃ)-কে বললঃ আমাদের কাছে তুমি

www.pathagar.com

আসার আগেও আমরা অত্যাচার সয়েছি। এখন তুমি এসেছ, তারপরও আমাদেরকে সে কষ্ট সইতে হচ্ছে।

মূসা (আঃ) এবারও আশার বাণী শুনিয়ে বললেনঃ খুব শীঘ্রই তোমাদের আল্লাহ তোমাদের দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। তিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার উপর তাদের জায়গায় বসিয়ে দেবেন; তারপর দেখবেন তোমরা কি কর। (সূরা আরাফঃ ১২৭-১২৯)

এতসব ঘটনার মধ্যে একদিন ফিরআউনের মনে হল, আল্লাহ যদি সত্যিই থেকে থাকেন, তাহলে তাঁকে তো দেখা দরকার। যেই ভাবা সেই কাজ। সে মন্ত্রী হামানকে বললঃ

হে হামান! তুমি আমার জন্য সুউচ্চ এক প্রাসাদ তৈরী কর। যেখান থেকে আমি আকাশে ওঠার একটি অবলম্বন (সিঁড়ি) পেয়ে যাব। সেখান থেকে আমি মূসার আল্লাহকে দেখতে চাই। তবে আমি তো ওকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। (সূরা মুমিনঃ ৩৬-৩৭)

ফিরআউন যে সত্যিই মূসা (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী মনে করত, এ ঘটনাটি জানা যায় কুরআনের আরো একটি আয়াত থেকে। সেখানে বলা হয়েছেঃ

ফিরাউন বললঃ হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রভু আছে বলে আমার জানা নেই। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি অত্যন্ত উঁচু প্রাসাদ (টাওয়ার) বানাও। হয়ত আমি এতে উঠে মূসার প্রভূকে দেখতে পাব। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে (মূসা) মিথ্যাবাদী। (আল্ কাসাসঃ ৩৮)

এসব কথা বলে ফিরআউন মূসা (আঃ)-কে সমাজের কাছে ছোট করতে চাইত। কেননা এটাতো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার যে, কোন টাওয়ার বানিয়ে তা থেকে আল্লাহকে দেখা একটা অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু হামান লেগে গেল সেই টাওয়ার বানানোর কাজে। আর এ কাজে লাগানো হল বনী ইসরাঈলের মুমিন লোকদের। তাদেরকে দিয়ে যে শুধু এ ধরণের ফালতু কাজই করানো হত, তা কিন্তু নয়। বরং শুধুমাত্র তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য নানান ধরণের কঠিন কাজ প্রতিদিন করাতো জালেমরা। যদি এসব কাজ না করতো, তবে মুমিনদের নানাভাবে কষ্ট দেয়া হত।

মূসা (আঃ) তখন জাতির লোকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেনঃ হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা মুসলিম হও; তবে তোমরা তাঁর উপরই ভরসা রাখ।

একথা জাতির লোকেরা ধৈর্যের সাথে মেনে নিল। বললঃ আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করলাম। আয় আল্লাহ! আমাদেরকে জালিমের জুলুমের শিকার করনা এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় জালেমের জুলুম থেকে বাঁচাও। (সূরা ইউনুসঃ ৮৪-৮৬)

www.pathagar.com

মূসা (আঃ)-কে এ সময় কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে। একদিকে রাজার জুলুমের প্রতিবাদ করা, অন্যদিকে অনুসারীদেরকে উৎসাহ দেয়া। কিন্তু এরপরও তিনি তাঁর কাজ এতটুকুও কমালেননা।

ফেরআউন যখন কোনভাবেই মূসা (আঃ)-কে ঠেকাতে পারল না, তখন সে রাগে অন্ধ হয়ে গেল। বলে ফেললঃ আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে খুন করব আর সে তার প্রভূর আশ্রয়ে চলে যাক। আমার ভয় হয় যে, সে তোমাদের ধর্মকে পাল্টে ফেলবে অথবা সে দুনিয়ায় বিপর্যয় ঘটাবে।

মূসা (আঃ) তার ঘোষণার জবাব দিলেন এভাবেঃ যারা বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে না, সেই সব অহঙ্কারী উদ্ধত লোক থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রভূ আল্লাহর আশ্রয় নিয়েছি। (সূরা মুমিনঃ ২৬-২৭)

পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়ংকর হয়ে উঠল। এক পক্ষে ফিরআউন নিজেকে ধর্মের রক্ষক ঘোষণা করে ধর্ম রক্ষার ঘোষণা দিতে লাগল। বলাবাহুল্য তার ধর্ম ছিল নিরপরাধ মানুষের উপর সীমাহীন নির্যাতন চালিয়ে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করা।

অন্যদিকে মূসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর নবী ও রাসুল। তিনি চেয়েছিলেন, ফিরআউনসহ আল্লাহর বিরোধী মানুষদেরকে ভাল পথে আনতে, পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে।

ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর (রঃ)-এর মতে, মূসা (আঃ)-এর বিরামহীন চেষ্টায় বনী ইসরাঈলের বাইরে মাত্র তিনজন লোক ঈমান এনেছিলেন। এঁরা ছিলেনঃ এক. ফিরআউনের একজন পারিষদ, ফিরআউনের স্ত্রী এবং অন্য একজন। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন দৃঢ় ঈমানদার ব্যক্তি।

যে পারিষদ ঈমান এনেছিলেন, তিনি ছিলেন ফিরআউনেরই বংশের লোক। তিনি প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দিতে পারেননি। তিনি ঈমান গোপন রাখতেন। যখন ফিরআউন মূসা (আঃ)-কে খুন করার ঘোষণা দিল, তখন এই মুমিন পারিষদ মুখ খুললেন। বললেনঃ

"তোমরা এক ব্যক্তিকে এ কারণে খুন করবে যে, সে বলেঃ আমার প্রভূ আল্লাহ, অথচ সে প্রভূর কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে? সে মিথ্যাবাদী হলে, তার মিথ্যা বলার জন্য সে দায়ী হবে। আর যদি সে সত্যি কথাই বলে থাকে, সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছু তো তোমাদের উপর আসবেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীদেরকে সৎপথে চলতে দেবেননা।

হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আজ তোমরা রাজত্বের অধিকারী এবং এই রাজ্যের বিজয়ী শক্তি (শাসক)। কিন্তু আল্লাহর আযাব এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?

www.pathagar.com

ফিরআউন নিজ লোকদের মধ্য থেকে এমন কোন কথা শুনতে আদৌ তৈরী ছিল না। তাই বললঃ আমি যা ভাল মনে করেছি, তাই বলেছি। আমি তো তোমাদেরকে ভাল পথই দেখাচ্ছি।

ঈমানদার পারিষদ কিন্তু থামলেন না। বললেনঃ হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আমার ভয় হয়, তোমাদের উপর সেই আযাব না এসে পড়ে, যে আযাব এসেছিলো এর আগে (নবীদেরকে অস্বীকার করার কারণে) বিভিন্ন জাতির উপর। যেমন এসেছিল নূহ, আদ, সামুদ ও তাদের পরের জাতিগুলোর উপর। আর একথা জেনে রাখো, আল্লাহ কখনো তার বান্দাদের উপর জুলুম করতে চান না।

হে আমার জাতি! আমার ভয় হয়, তোমাদের উপর এমন একটি সময় এসে পড়বে, যখন তোমরা ফরিয়াদ করবে, অনুতপ্ত হবে, একে অপরকে ডাকাডাকি করতে থাকবে আর দৌড়ে পালাতে থাকবে, কিন্তু তখন আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাবার কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ যাকে ভুল পথে পাঠিয়ে দেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারেনা।

এর আগে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ। তোমরা তার নিয়ে আসা শিক্ষা নিয়েও সন্দেহ করেছিলে। তাঁর মৃত্যুর পর তোমরা বলেছিলেঃ 'তার পরে আল্লাহ কোন রাসূল পাঠাবেন না।' এভাবেই আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সন্দেহবাদীদের।

তোমরা আল্লাহর প্রমাণ নিয়ে বিরোধিতা করছ, অথচ তোমাদের কাছে তো কোন প্রমাণ নেই। তোমাদের এসব বিরোধিতা আল্লাহ এবং মুমিনদের জন্য অত্যন্ত ঘৃণার ব্যাপার। এভাবেই আল্লাহ অহংকারী ও স্বৈরাচারী লোকদের বিবেকের দরজা বন্ধ করে দেন।" (সূরা মুমিনঃ ২৮-৩৫)

তিনি আরও বললেনঃ "হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আমার কথা মেনে নাও। আমি তো তোমাদের সঠিক পথ দেখাচ্ছি।

ভায়েরা আমার! এই দুনিয়ার জীবন তো মাত্র ক'দিনের। কিন্তু পরকাল তো অনন্ত, ওখানে তো চিরদিন থাকতে হবে। যে এখানে খারাপ কাজ করবে, ওখানে সে এর শাস্তি পাবে। আর এখানে যেসব নারী-পুরুষেরা মুমিন হয়ে ভাল ভাল কাজ করবে, তারা যাবে জান্নাতে। সেখানে তাদেরকে এত পুরস্কার দেয়া হবে, যা পরিমাণে হিসাব করা যাবে না।

হে আমার জাতি! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদের ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমায় ডাকছ আগুনের দিকে। তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে আর তাঁর সমান আর কাউকে দাঁড় করিয়ে দিতে, যে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই; কিন্তু আমি তোমাদেরকে ডাকছি অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও দয়ালু আল্লাহর দিকে।

www.pathagar.com

আর নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে ডাকছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও ডাকবার উপযুক্ত নয়। আসলে আমাদেরকে তো আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে আর যারা সীমালংঘনকারী, তারা জাহান্নামে বসবাস করবে।

আমি তোমাদেরকে যা বলেছি, তোমরা খুব তাড়াতাড়িই সে কথা স্মরণ করবে। আর আমার ব্যাপারটি আমি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। (সূরা মুমিনঃ ৩৮-৪৪)

তারপর আল্লাহ ঐ মুমিন ব্যক্তিকে ফিরআউনের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। আর কঠিন শাস্তি দিয়ে ঘিরে ফেললেন ষড়যন্ত্রকারীদেরকে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলছেনঃ

"আমি তো ফিরআউনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে আক্রমণ করেছি, যেন তারা বুঝতে পারে।

যখন তাদের ভাল কিছু হত, তারা বলতঃ এটাতো আমাদের পাওনা। আর যখন কোন ক্ষতি হতো, তখন তারা বলত মূসা ও তাঁর সাথীরা অলুক্ষুণে (তাই আমাদের এই ক্ষতি হলো)। তাদের এই ক্ষতি তো আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

তারা বলতঃ আমাদেরকে জাদু করার (বোঝাবার) জন্য তুমি যা কিছুই দেখাও না কেন, আমরা তোমাকে কোনভাবেই বিশ্বাস করবো না।

তারপর আমি (আল্লাহ) তাদেরকে বন্যা, পঙ্গপাল, উকুন, বমি ও রক্ত দিয়ে আযাব দিই। এগুলি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ওরা অহঙ্কারী হিসেবেই রয়ে গেল। আর তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। (আরাফঃ ১৩০-১৩৩)

জাদুকররা যখন প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে ঈমান আনল, তখন আল্লাহর দুশমন ফিরআউন কুফরী ও অপরাধ, অত্যাচার করতেই থাকল। তখন আল্লাহ একে একে তার সামনে বিভিন্ন নিদর্শন দেখালেন। প্রথমেই এল দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের কাছে হেরে গেল ওরা। মূসা (আঃ)-কে বললঃ

হে মূসা! তুমি তোমার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য আবেদন জানাও, তোমার সাথে তিনি যে ওয়াদা করেছেন সে অনুযায়ী। যদি তুমি আমাদেরকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পার, তবে আমরা তো ঈমান আনবোই, সেইসাথে বনী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে অবশ্যই যেতে দেব। (আরাফঃ ১৩৪)

তখন মূসা (আঃ) আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন। আল্লাহতায়ালাও আবেদন মঞ্জুর করে শাস্তি তুলে নিলেন। কিন্তু ফিরআউন তাঁর ওয়াদা রাখল না।

তারপর আল্লাহ পাঠালেন পঙ্গপালের শাস্তি। পঙ্গপাল তাদের গাছপালা সব খেয়ে ফেলল। এমনকি তাদের ঘরের দরযার লোহার

www.pathagar.com

পেরেক পর্যন্ত খেয়ে ফেলল ওরা। ফলে তাদের বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়তে লাগল। তখন অপরাধীরা আগের মত মূসা (আঃ)-কে ধরল। মূসা (আঃ)-এর দু'আয় এবারও তারা এ শাস্তি থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী কাজ করল না।

এরপর এল উকুনের শাস্তি। দেখা গেল, ফির্আউন আর তার অনুসারীদের বাড়ি-ঘরে, খাবারে, বিছানায় ছেয়ে গেছে উকুন। উকুনের অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে পড়ত ওরা। রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল ওদের। অপরাধীরা যথারীতি ছুটে এল মূসা (আঃ)-এর কাছে। মূসা (আঃ)-এর দু'আয় এবারও তারা এ শাস্তি থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু ওয়াদা ভুলে গেল।

এরপরে এল ব্যাঙের উৎপাতের পালা। ব্যাঙেরা তাদের খাবার ও পাত্রের মধ্যে লাফিয়ে পড়ত। কোন পাত্রের মুখ খুললেই সেখানে ঢুকে পড়ত ব্যাঙ। কোন পাত্র খুললে দেখা যেত, সেখানে আগেই পৌঁছেছে ব্যাঙ। এবারও তারা মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে এ গযব থেকে রেহাই পেল।

সবশেষে এল রক্তের খেলা। যখনি ওরা পানি পান করতে চাইত, সেখানে দেখত রক্ত। এমনকি নীলনদের মত নদীতে পানি খেতে চাইলে সেখানেও রক্ত। প্রতিটি পানির উৎসই তাদের কাছে হয়ে গিয়েছিল রক্তের উৎস।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ শাস্তি নেমে আসত শুধু অপরাধী ফিরআউনের অনুসারী কিবতীদের উপর। আর যারা মূসা (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিলেন তারা এবং বনী ইসরাঈলের লোকজন ছিল এ শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তাই অতি স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়, এ শাস্তিগুলো ছিল শুধু অপরাধীদের জন্যই। এগুলো ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও অকাট্য নিদর্শন ও দলীল। কিন্তু তারপরও ফিরআউন ও তার অনুসারী কিবতীরা ঈমান আনল না।

আল্লাহতায়ালাও শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তড়িঘড়ি করলেননা। তিনি তাদেরকে বারবার সুযোগ দিয়েছেন নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়ার জন্য। কিন্তু তারা নিজেদেরকে সংশোধনের পরিবর্তে আরো বেশী অপরাধী প্রমান করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেনঃ

"আমি যখনই তাদের উপর থেকে শাস্তি সরিয়ে নিতাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যা তাদের জন্য নির্ধারণ করা ছিল, তারা তখনই তাদের ওয়াদা ভেঙ্গে ফেলত।

তাই আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি আর তাদেরকে সুগভীর সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি। কারণ তারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করতো এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।" (আ'রাফঃ ১৩৫-১৩৬)

অন্য সূরাতেও আল্লাহতায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

www.pathagar.com

"মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমাকে তো জগতসমূহের প্রভু পাঠিয়েছেন। তিনি আমার নিদর্শনসহ তাদের কাছে আসা মাত্রই তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।

আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি, যা তার ওরকম নিদর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম, যেন তারা ফিরে আসে।

ওরা বলেছিলঃ হে জাদুকর! তোমার প্রভুর কাছ থেকে তুমি আমাদের জন্য তাই চাও, যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করেছেন, তা হলে আমরা অবশ্যই সৎপথে চলতে আরম্ভ করবো। তারপর যখন আমি তাদের উপর থেকে শাস্তি সরিয়ে নিলাম, তখনই তারা ওয়াদা ভুলে গেল।

ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষণা করলঃ হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? আর এ নদীগুলো তো আমার পাদদেশ (নিচ) দিয়ে বয়ে চলেছে, তোমরা কি তা দেখ না? আমি তো এই লোক থেকে শ্রেষ্ঠ, যে হীন এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারেনা। মূসাকে কেন দেয়া হল না সোনার বল অথবা তার সাথে কেন দল বেঁধে ফেরেশতারা এল না?

এসব কথা বলে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল (চিন্তা শক্তিকে থামিয়ে দিল)। তাই তারাও ফিরআউনকে মেনে নিল। ওরা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

যখন ওরা আমাকে রাগিয়ে দিল, আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম আর ডুবিয়ে দিলাম তাদের সবাইকে। তারপর পরবর্তীদের জন্য তাদেরকে বানিয়ে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত হিসেবে। (যুখরুফঃ ৪৬-৫৬)

আল্লাহতায়ালা তাঁর রাসূলকে এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছিলেন, যেন তাঁরা জনগণের সম্মান ও আস্থা অর্জন করতে পারে। জনগণ যেন কুফর ও শিরক বাদ দিয়ে সত্য ও সঠিক পথে ফিরে আসে। অথচ তারা বিষয়টি বুঝতেই চাইল না। বরং তারা এসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল। আল্লাহ তাদের জন্য একের পর এক নিদর্শন পাঠাতেই থাকলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

ফিরআউন কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিল। সে যখন দেখল মূসা (আঃ)-এর নিদর্শনের সামনে সে অসহায়, তখন সে রাজ্যের নানান সৌন্দর্যের কথা বলে জনগণকে ভুলিয়ে রাখল। এমনকি সে মূসা (আঃ)-এর দৈহিক ব্যাপারেও কটাক্ষ করল। সে মুসা (আঃ)-এর জিহবার আড়ষ্ঠতাকে দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করল।

বিষয়টিকে সহজভাবে বললে এভাবে বোঝা যাবে, আমাদের সমাজের অধিকাংশ নেতা-ই একবাক্যে স্বীকার করেন, ইসলাম সুন্দর,

www.pathagar.com

ইসলামের প্রতিটি বিষয় চমৎকার। কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে কোন উদাহরণ টানতে চাইলে চকচকে রঙিন পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই সামনে নিয়ে আসেন। ইসলামী আদর্শকে খাটো করতে তখন এ লোকদের এতটুকু বাঁধে না। ফিরআউন সবই বুঝত, কিন্তু নিজের অহঙ্কারকে বজায় রাখার জন্যই সে লোকদেরকে ভুল বোঝাতো।

ফিরআউন এত কিছু দেখার পরও কিন্তু ঈমান আনেনি। বরং তার অত্যাচারে অতীষ্ট মুমিনরা সালাত আদায়ের জন্য বাড়ির বাইরেও বের হতে পারত না। তাই আল্লাহতায়ালা বাড়ির ভিতরেই সালাত আদায়ের জন্য তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ফিরআউনকে পথে আনার সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন মূসা (আঃ) একদিন ভাই হারুন (আঃ)-কে সাথে নিয়ে বদদু'আ করলেন। বললেনঃ

"হে আমাদের প্রভূ! তুমি ফিরআউন ও তার সভাসদদেরকে দুনিয়ার সৌন্দর্য ও সম্পদ দান করেছ, যা দিয়ে হে আমাদের প্রভু! ওরা লোকদেরকে ভুল পথে নিয়ে যায়। হে আমাদের প্রভু! তাদের সম্পদ তুমি ধ্বংস করে দাও, তাদের অন্তর কঠিন করে দাও, ওরা তো কঠিন শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।"

আল্লাহতায়ালাও মূসা (আঃ)-এর দু'আ কবুল করলেন। বললেনঃ

"তোমাদের দুইজনের দু'আ কবুল করে নিলাম, সুতরাং তোমরা দৃঢ় হয়ে থাক এবং তোমরা কখনও মূর্খদের অনুসরণ করবে না।" (ইউনুসঃ ৮৮-৮৯)

অর্থাৎ তারা দুনিয়ার চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য, চমৎকার যানবাহন, সুবিশাল প্রাসাদ, নানাধরণের সুস্বাদু খাবার-দাবার, জনগণের উপর কর্তৃত্ব ইত্যাদির মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়েছিল। ওরা মনে করত, এসবই তাদের কাজের ফলাফল। এগুলোকে তারা খুব বেশী ভালবাসতে গিয়ে এগুলোর দাতা আল্লাহকেই অস্বীকার করে বসত।

আল্লাহ যখন মূসা (আঃ)-এর দু'আ কবুল করে নিলেন, তখন তাদের এসব সম্পদ পাথরে পরিণত হয়ে গেল, সেগুলো তাদের কোন কাজেই আর এলো না। অবস্থা বড়ই খারাপ হয়ে পড়ল ওদের জন্য।

এ অবস্থায় একদিন শহরের এক প্রান্ত থেকে এক মুমিন ছুটে এলেন মূসা (আঃ)-এর কাছে। তিনি ফিরআউনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতেন। তাই বললেনঃ "হে মূসা (আঃ)! ফিরআউনের পারিষদবর্গ আপনাকে খুন করার জন্য পরামর্শ করছে। তাই আপনি বের হয়ে পড়ুন। আমি তো আপনার একজন মঙ্গলকামী।"

ইতিমধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকেও হিজরতের হুকুম পেয়ে গেলেন মূসা (আঃ)। মুমিন ব্যক্তিগণ এবং বনী ইসরাঈলের প্রত্যেককে তৈরী হওয়ার

www.pathagar.com

নির্দেশ দিলেন তিনি। কিন্তু শহর ছেড়ে বের হবেন কি করে? শহরের বাইরে যেতে হলেও তো ফিরআউনের অনুমতি প্রয়োজন।

তাই এক ঈদের দিনে উৎসব করার জন্য শহরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন তিনি ফিরআউনের কাছে। ফিরআউনও কেন যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনুমতি দিল। অনুমতি পেয়ে বনী ইসরাঈলের লোকজন পুরোপুরি তৈরী হয়ে গেলেন। আসলে এটা ছিল বনী ইসরাঈলের একটি চালাকি মাত্র, যেন তারা ফিরআউন ও তার অনুসারীদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

এক অন্ধকার রাতে মূসা (আঃ) ও তার অনুসারীদের বিশাল কাফেলা বের হয়ে পড়ল মিসর ছেড়ে। ঐতিহাসিকদের মতে, এ কাফেলার সদস্য ছিলেন লক্ষাধিক লোক। বিরামহীনভাবে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তারা এগিয়ে গেলেন সিরিয়ার দিকে।

ওদিকে ফিরআউন যখন জানতে পারল, মূসা (আঃ) সাথীদের নিয়ে মিসর ছেড়েছে, তখন সে প্রচন্ড রকম ক্ষেপে গেল। নিজের বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সেও পিছু ধাওয়া করল। একেবারে ধ্বংস করেই সে ছাড়বে মূসা (আঃ)-এর সাথীদেরকে।

ফিরআউনের বাহিনী এক সকালে মূসা (আঃ)-এর সাথীদের দেখা পেয়ে গেল। পরিস্থিতি তখন বলছিল, মুখোমুখি যুদ্ধ তো নিশ্চিত। আর যুদ্ধ মানেই নিশ্চিত পরাজয়। প্রচন্ড ভয়ে কেঁপে উঠলেন ঈমানদাররা। বললেনঃ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।

তাঁদের ভয় পাওয়ারও যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁদের সামনে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগর আর ডানে-বায়ে সুউচ্চ খাড়া পাহাড়। পিছনে দুশমনের বাহিনী। তাঁরা স্পষ্টতই ফিরআউনের বাহিনীকে দেখতে পাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেছেনঃ

"আমি মূসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী পাঠিয়েছিলাম এই বলে যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বের হয়ে পড়; তোমাদেরকে তো পিছু ধাওয়া করা হবে। তারপর ফিরআউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল এই বলে যে, এরা (বনী ইসরাঈল) তো একটি ছোট্ট দল। ওরা তো আমাদেরকে প্রচন্ড রকম ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আর আমরা তো সবাই অতি শঙ্কিত।

(তাদের এই পিছু ধাওয়া করার) ফলাফল হিসেবে আমি ফিরআউন গোষ্ঠিকে বের করে আনলাম তাদের বাগান ও ঝর্ণাসমূহ এবং ধন-ভান্ডার ও সুরম্য প্রাসাদসমূহ থেকে।

এরকমটাই ঘটেছিল আর বনী ইসরাঈলকে করেছিলাম এসব সম্পদের অধিকারী। ওরা সকাল বেলায় তাদের পেছনে এসে পড়ল।

www.pathagar.com

তারপর তারা দুই দল যখন একে অপরকে দেখল, তখন মূসার সাথীরা বললঃ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।

মূসা (আঃ) বললেনঃ কখনও না। আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রভূ, খুব শীঘ্রই তিনি আমাদের পথ দেখাবেন।

তারপর মূসার প্রতি ওহী এলঃ 'তোমার লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত কর।' ফলে সাগর বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড়ের মত হয়ে গেল। (সূরা শুয়ারাঃ ৫২-৮০)

আল্লাহর কাছে এরকমটি করা কোন ব্যাপারই নয়। কেননা তিনি শুধু বলেনঃ 'হও।' আর তা হয়ে যায়। সেই মহান আল্লাহর নির্দেশে সাগরের জলরাশি পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে যাবে, এটাই তো স্বাভাবিক। ঐতিহাসিকদের মতে, তারপর আল্লাহ সেখানে বিশেষ ধরণের বাতাস পাঠালেন। যার ধাক্কায় পানি সরে গিয়ে রাস্তাগুলি শুকিয়ে গেল, যেন ঘোড়া ও অন্যান্য প্রাণীর খুর আটকে না যায়।

এভাবে পরাক্রমশালী আল্লাহর আদেশে যখন সাগরের অবস্থা এমন হল, তখন মূসা (আঃ) নির্দেশ মত সাথীদের নিয়ে ঐ পথে খুবই আনন্দের সাথে নেমে পড়লেন। তাদেরকে যারা দেখছিল, তাদের চোখ ঝলসে গেল, তারা হতবাক হয়ে গেল! একি দেখলাম! এও কি সম্ভব!

আর এরকম সব দৃশ্য মু'মিনদের অন্তরসমূহকে সঠিক পথ দেখায়। তারা পরম নিশ্চিন্তে সাগর পাড়ি দিলেন। তাদের শেষ সদস্য যখন সাগর যাত্রা শেষ করলেন, তখনই ফিরআউন এসে হাজির হল সাগর পাড়ে। সেও দেখল সাগরের রাজপথ।

ফিরআউন যেন এ পথে আসতে না পারে, সেজন্য মূসা (আঃ) লাঠি দিয়ে আবার আঘাত করতে চাইলেন সাগরে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। আল্লাহতায়ালা নিষেধ করলেন তাঁকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

"তাদের আগে আমি তো ফিরআউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম। আর তাদের কাছেও এসেছিলেন এক সম্মানিত রাসূল। তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। আর তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি কর না। আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি স্পষ্ট প্রমাণ। তোমরা যেন আমাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করতে না পার, সেজন্য আমি আমার প্রভূ এবং তোমাদের প্রভূর আশ্রয় নিয়েছি। যদি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করতে না পার, তবে আমার থেকে দূরে থাক।

তারপর মূসা (আঃ) তাঁর প্রভুর কাছে আবেদন জানালেনঃ এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।

www.pathagar.com

আমি (আল্লাহ) বলেছিলামঃ তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বের হয়ে পড়; তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে। সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, ওরা এমন এক বাহিনী যা ডুবে যাবে। ওরা পেছনে রেখে এসেছিল কত উদ্যান ও ঝর্ণাধারা, কত শস্যক্ষেত্র ও নজরকাড়া প্রাসাদ, কত বিলাস সামগ্রী, ওতে তারা আনন্দ পেত।

এমনটাই ঘটেছিল আর আমি এসব কিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য একটি জাতিকে। আকাশ এবং পৃথিবীর কেউই ওদের জন্য চোখের পানি ফেলেনি আর ওদেরকে কোন সুযোগও দেয়া হয়নি। আমি তো বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের কষ্ট ও অপমানসূচক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি। ফিরআউন তো ছিল অতিরিক্ত সীমালংঘনকারীদের একজন। আমি জেনে শুনেই ওদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম আর ওদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী- যেখানে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা। (দুখানঃ ১৭-৩৩)

সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে ফিরআউন সবকিছু দেখল। এবং সাগরের অবাক দৃশ্যটিও সে খুব ভালভাবে খেয়াল করল। গোটা বিষয়টিই সে বুঝতে পারল, এসবই মহান আল্লাহর কুদরতের খেলা। এরকমটি তো সে আগেও দেখেছে। এতদিন পর তার মাঝে ভর করল এক অজানা ভয়-শঙ্কা।

সে থমকে দাঁড়াল। আর এগোতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলের পিছু ধাওয়া করার জন্য সে অনুতপ্ত হল। কিন্তু এখন যে তার আর পিছনে ফেরার পথ নেই। একথাও সে ভালই বুঝল।

কিন্তু সেনাবাহিনীর সামনে তো ভীত-শঙ্কিত চেহারা দেখানো যাবে না। তাদের সামনে সে বীর সেনাপতি হিসেবেই থাকতে চাইল। যে সম্প্রদায়কে সে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল, তাই তারা তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল, এরা তো তার পেছনেই ছিল।

সে ঐসব হতভাগ্য লোকদের বিবেকের উপর আরও একবার আবরণ ছড়িয়ে দিতে বললঃ তোমরা একটু খেয়াল করে দেখ, সাগর আমার জন্য কিভাবে সরে গিয়ে কেমন পথ বানিয়ে দিয়েছে, যেন আমি ঐসব পলাতক দাসদের ধরতে পারি- যারা আমার আনুগত্যকে অস্বীকার করেছে। (ঠিক যেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ জুনিয়র এবং তার সমর্থক জনতা)

ফিরতে চাইলেও ফেরার পথ বন্ধ ফেরআউনের। একসময় সে ঢুকে পড়ল সাগরের সেই আলৌকিক পথে। দেখতে দেখতে ফেরআউনের গোটা বাহিনীই প্রবেশ করল সেই পথে। একসময় অন্য প্রান্তে পৌঁছে গেল তারা।

ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহর নির্দেশে সাগরের উপর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন মূসা (আঃ)। সাগর ফিরে গেল তার আগের চেহারায়। ফিরআউন আর তার অনুসারী কিবতীরা হারিয়ে গেল সুগভীর সাগরের

www.pathagar.com

অতল তলে। তাদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে চলল উত্তাল স্রোত-তরঙ্গ। তাদের একটি লোকও রেহাই পেল না, প্রত্যেকেই মারা পড়ল।

ফিরআউনকে আল্লাহ মৃত্যুর সময়ে কিছু কথা বলার সুযোগ দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছেঃ

"আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করলাম; এবং ফিরআউন ও তার সেনাবাহিনী প্রচন্ড অহঙ্কারে সীমালংঘন করে তাদের পিছু ধাওয়া করল। সবশেষে যখন সে ডুবে গেল, তখন বললঃ আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাঈল যাকে (সেই আল্লাহকে) বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, প্রভু নেই। আমি তো আত্মসমর্পণকারীদেরই একজন।

এখন (কেমন হল)! এর আগে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে। আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য উদাহরণ হয়ে থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে জানে না।" (ইউনুসঃ ৯০-৯২)

ফিরআউনের ধ্বংসের ব্যাপারে আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

"ফিরআউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে দুনিয়ার উপর অহঙ্কার করেছিল। আর ওরা মনে করেছিল যে, ওরা আমার কাছে ফিরে আসবে না।

তাই আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সাগরে ছুঁড়ে ফেললাম। দেখ, জালিমদের পরিণতি কি হয়ে থাকে।

ওদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম; ওরা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকত; কিয়ামতের দিনে ওদেরকে কোন সাহায্য করা হবে না।

এ দুনিয়ায় আমি ওদের পেছনে লাগিয়েছি অভিশাপ আর কিয়ামতের দিনেও ওরা হবে ঘৃণিত।" (আল কাসাসঃ ৩৯-৪২)

ফিরআউন ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহতায়ালা হেফাজত করলেন তার বর্মপরা দেহটি। ফিরআউনের মৃত্যুর দিনটি ছিল আশুরার দিন অর্থাৎ ১০ই মহররম। প্রিয়নবী (সাঃ) ফিরআউনের মৃত্যু এবং বনী ইসরাঈলের মুক্তির স্মরণে এই দিনটিতে সিয়াম (রোযা) পালনের জন্য মুসলমানদেরকে বলেছিলেন।

অত্যাচারী ফেরআউন এবং ভবিষ্যতে যারা ফেরআউনের অনুসারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

"যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রভুর শাস্তি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না, যদি তাদের কাছে প্রত্যেকটি নিদর্শন আসে- যতক্ষণ না তারা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক শাস্তি না দেখবে।" (ইউনুসঃ ৯৬-৯৭)

"তারপর তারা যখন আমার শাস্তি দেখল, তখন বললঃ আমরা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করলাম এবং আমরা তার সাথে যাদেরকে অংশীদার মনে করতাম, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। ওরা যখন আমার শাস্তি

www.pathagar.com

দেখল, তখন ওদের ঈমান ওদের কোন কাজেই আসল না। আল্লাহর এই নিয়ম বহু আগে থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চালু রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।" (সূরা মুমিনঃ ৮৪-৮৫)

ফিরআউনরা সাগর তল থেকে গিয়ে হাজির হল জাহান্নামে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

"তাদেরকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে হাজির করা হয়। আর যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন বলা হবেঃ ফিরআউন ও তার অনুসারীদেরকে ছুঁড়ে ফেল ঐ কঠিন শাস্তির মাঝে।

এরপর ওরা জাহান্নামের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবে। দুর্বল লোকেরা অহঙ্কারী লোকদেরকে বলবেঃ আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে এই জাহান্নামের আগুন কিছুটা হলেও কমাতে পারবে?

অহঙ্কারীরা জবাব দেবেঃ আমরা সবাই-ই তো জাহান্নামে পৌঁছেছি। আল্লাহ নিশ্চয়ই তো বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন।

আগুনের মাঝেই যাদের বসবাস, তারা তখন জাহান্নামের পাহারাদারদের বলবেঃ তোমাদের প্রভুর কাছে একটু আবেদন কর, তিনি যেন আমাদের এক দিনের শাস্তি হলেও মাফ করে দেন।

পাহারাদারঃ তোমাদের কাছে কি স্পষ্ট দলীল নিয়ে রাসূলগণ যাননি?

জাহান্নামীরাঃ অবশ্যই এসেছিলেন।

পাহারাদারঃ তবে তোমরাই এখন আবেদন জানাও।

আর কাফেরদের আবেদন তো ব্যর্থ হবেই। (সূরা মুমিনঃ ৪৫-৫০)

(তথ্যসূত্রঃ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ও আল কুরআনুল কারীম)

কুরআনের একটি বিশাল অংশে আল্লাহতায়ালা অত্যাচারী ফিরআউনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এটা শুধুমাত্র ইতিহাস নয়, বরং এর প্রতিটি অংশে রয়েছে আমাদের জন্য অনেক অনেক শিক্ষা। তাই আমাদের প্রয়োজন এ ঘটনাগুলিকে গভীর মনোযোগের সাথে পড়া এবং সুন্দরভাবে বোঝা।

আজ মূসা (আঃ) নেই, নেই ফিরআউনও। কিন্তু আছে কুরআন, আছে আল্লাহদ্রোহী শক্তি। আজ আমাদেরকে জেগে উঠতে হবে মূসা (আঃ)-এর মত সুসভ্য বলে দাবীদার অত্যাচারী জালিমদের বিরুদ্ধে।

www.pathagar.com

প্রতিদান

আল্লাহর রাসুলের এক সম্মানিত সাহাবী ছিলেন হযরত সাবিত ইবন কায়স (রাঃ)। জাহিলী যুগে তিনি একবার বন্দী হয়েছিলেন প্রতিপক্ষের হাতে। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন 'জাবির' নামক এক ইহুদী।

এরপর ইতিহাসের পাতা পাল্টে গেল। মদীনায় এলেন প্রিয়নবী (সাঃ)। সেখানকার ইহুদীরা ষড়যন্ত্র পাকাতে আরম্ভ করল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে। এক পর্যায়ে অপরাধী ইহুদী পুরুষদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করলেন নবীজী।

মৃত্যুদন্ড প্রাপ্তদের মধ্যে সেই ইহুদী জাবিরও ছিল। সাবিত (রাঃ) কিন্তু মনে রেখেছিলেন জাবিরের কথা। তিনি আন্তরিকভাবে জাবিরের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। বিপদের দিনে তিনি গেলেন জাবিরের কাছে। জাবির তখন এক বুড়ো মানুষ।

সাবিতকে কাছে পেয়ে জাবির বললঃ আবু আবদুর রহমান, তুমি কি আমায় চিনেছো?

সাবিত (রাঃ) বললেনঃ আমার মত মানুষ কি আপনার মত মানুষকে ভুলতে পারে? আজ আমি এসেছি আপনার ঋণ পরিশোধের আশায়।

জাবিরঃ ভালো লোকেরাই তো ভালো লোকদের প্রতিদান দেয়।

এরপর সাবিত রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে জাবির একবার খুব বড় উপকার করেছিল। আমি তার প্রতিদান দিতে চাই। তার রক্ত আমাকে দান করুন। অর্থাৎ তার জীবন ভিক্ষা দিন।

রাসূল (সাঃ) সাহাবীর আবেদন মঞ্জুর করলেন। বললেনঃ হাঁ, তাই হোক।

সাবিত ফিরে গেলেন জাবিরের কাছে। বললেনঃ রাসূল (সাঃ) তোমার রক্ত আমাকে দান করেছেন। আর আমি তোমাকে তা ফিরিয়ে দিলাম।

জাবির বললঃ এখন আমি একজন পরিবার-পরিজনহীন বৃদ্ধ, জীবন দিয়ে আমার কি হবে?

সাবিত আবারও ফিরে গেলেন রাসূল (সাঃ)-এর কাছে। বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি জাবিরের স্ত্রী ও সন্তানদেরকেও আমাকে দান করুন।

এবারও রাসূল (সাঃ) তাঁর কথা রাখলেন। বললেনঃ তারা তোমার।

www.pathagar.com

সাবিত ফিরে গিয়ে জাবিরকে জানালেন এ কথা। বললেনঃ রাসূল (সাঃ) তোমার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদেরকে আমায় দিয়েছেন। আমি তাদের সবাইকে তোমাকে দিলাম।

পরিবারের সবাইকে ফিরে পেয়ে বুড়ো জাবির বললঃ হিজাজের একটি পরিবার- যাদের কোন সহায়-সম্পদ নেই, তাঁরা বাঁচবে কেমন করে?

সাবিত আবার রাসূল (সাঃ)-এর কাছে ফিরে গিয়ে জাবিরের সম্পদ ফিরিয়ে আনলেন। জাবিরকে তা জানিয়েও দিলেন।

এরপর বুড়ো বললঃ ওহে সাবিত! চাইনিজ আয়নার মত দেখতে যে যুবকের চেহারা, সেই কা'ব ইবনে আসাদের খবর কি?

সাবিতঃ সে তো নিহত হয়েছে।

জাবিরঃ আমাদের আনন্দ-বিপদে যে লোকটি আগে আগে থাকত, আমরা পালালে যে আমাদের বাঁচাত, সেই আযযাল ইবন সামায়েলের দশা কি হয়েছে?

সাবিতঃ সেও নিহত হয়েছে।

জাবিরঃ মজলিস দু'টি- অর্থাৎ বনু কা'ব ইবন কুরায়জা ও বনু আমর ইবন কুরায়জার (অপরাধী ইহুদী গোত্রদ্বয়) কি পরিণতি কি হয়েছে?

সাবিতঃ তাদেরকে হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আক্ষেপে ভেঙ্গে পড়ল জাবির। বললঃ ওহে সাবিত! তোমার ওপর আমার যে অনুগ্রহ আছে, তার বিনিময়ে তুমি আমাকে আমার জাতির পরিণতি বরণ করার সুযোগ করে দাও। আল্লাহর কসম! তাদের মৃত্যুর পর আমার বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই। তাদের ছাড়া শুধু জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার ধৈর্যও আমার নেই।

কিন্তু সাবিত এ সুযোগ দিয়েছিলেন কি-না তা ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেননি। তবে সাবিত তার প্রতিদান দিতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি। আর প্রিয়নবীও সাবিতকে প্রতিদান দেয়ার সুযোগ করে দিয়ে, নিজের সাহাবীকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন।

(আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৪র্থ খন্ড)

ইহুদীদেরকে কোন অপরাধের কারণে এই কঠিন পরিণতি বরণ করে নিতে হয়েছিল সে কাহিনী আমরা আগামী খন্ডগুলোতে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

আট শহীদের বাবা

বদরের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে মক্কার কুরাইশ বাহিনী। এ পরাজয় তাদের ক্রোধের আগুনকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। তাদের ভিতর তখন একটিই আলোচনা- প্রতিশোধ। যেভাবেই হোক প্রতিশোধ নিতে হবে। এ আলোচনা শুধু কোন এক কুরাইশ পরিবারে নয়, বরং মক্কার প্রতিটি ঘরে ঘরে।

ওরা বিশ্বাস করতো আরেকবার মোকাবিলা হলে, মুসলিমদেরকে তারা পরাজিত করতে পারবে। এজন্য তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিল। বদরের যুদ্ধের বছর খানেক পরেই তারা বেরিয়ে পড়ল মদীনা আক্রমনের জন্য।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যথাসময়ে খবর পৌঁছে গেল। তিনিও জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মদীনার বাইরে। ওহুদের প্রান্তরে মুখোমুখি হলেন কুরাইশদের।

তখন তো আর রেডিও-টেলিভিশন ছিল না। তাই যে কোন খবর চাইলেই সবার কাছে সময়মত পৌঁছানো যেত না। এজন্য প্রিয়নবীর সকল সাহাবীর কাছে জিহাদের খবর একই সময়ে পৌঁছেনি।

হানজালা (রাঃ) ছিলেন এক যুবক সাহাবী। মাত্র বিয়ে করেছেন তিনি। বাসরের স্বপ্নীল অনুভূতি পেরিয়ে তখনও পবিত্র হননি তিনি। এমনি সময় প্রিয়নবীর ঘোষকের কাছে শুনলেন জিহাদের ডাক।

জিহাদের আহবানে মূহুর্তেই হারিয়ে গেল তাঁর বাসরের মাদকতা। ভুলে গেলেন তিনি, এখনও যে তাঁর গোসল হয়নি। বাসরের নেশা কেটে গিয়ে তাঁর চোখে ভর করল শাহাদাতের অদম্য নেশা।

পবিত্র মনে অপবিত্র দেহে তিনি ছুটে গেলেন ওহুদের ময়দানে। হাতে তার খোলা তলোয়ার। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। হানজালা ছুটে গেলেন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে। আক্রমণ করতে না করতেই তিনি পাল্টা আক্রমনের শিকার হলেন আরেক মুশরিক শাদ্দাদের। সে আঘাত সইতে পারলেন না হানযালা। শহীদ হয়ে গেলেন। স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেল।

কিন্তু অপবিত্র দেহে জান্নাতে যাবেন কেমন করে? অতি পবিত্র সেই স্বর্গীল শহরে তো অপবিত্র দেহের ঠাঁই নেই। প্রিয়নবীও জানেন না হানজালার কথা। শহীদদের কিন্তু গোসল ছাড়াই দাফন দিতে হয়। তাহলে কি হবে এখন?

হঠাৎ প্রিয়নবী দেখলেন ফেরেশতারা গোসল করিয়ে দিচ্ছেন তাঁরই প্রিয় সাহাবী হানজালাকে। দারুন কৌতুহল সৃষ্টি হল মুজাহিদদের মাঝে। ব্যাপার কি জানতে চাইলেন তিনি হানজালার স্ত্রীর কাছে।

www.pathagar.com

স্ত্রী বললেনঃ হানজালা নাপাক ছিলেন। আমি তাঁর মাথার একটি অংশ কেবল ধুইয়েছি, এমন সময় জিহাদের ডাক তাঁর কানে গেল। গোসল সম্পূর্ণ না করেই তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

একথা শুনে রাসূল (সাঃ) বললেনঃ এইজন্য আমি ফিরিশতাদেরকে তাঁকে গোসল দিতে দেখেছি।

আর তখন থেকেই হানজালার উপাধি হল 'গাসীসুল মালায়িকা' বা ফেরেশতাদের দ্বারা গোসলপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

সাহাবীদের শাহাদাতের এই তীব্র কামনা-আকাঙ্খা কি সাময়িক কোন আবেগ ছিল? ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। বরং কুরআনের আয়াত আর প্রিয়নবীর হাদীস-ই তাঁদেরকে উৎসাহ যোগাত জিহাদের ময়দানে অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার।

হানজালা (রাঃ) যখন শাহাদাতবরণ করেন, তখন তাঁর একটি মাত্র ছেলে ছিল। আবদুল্লাহ। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাত কি আট। পরিণত বয়সে তিনি পিতার খ্যাতির প্রতি নজিরবিহীন সুবিচার করেন।

হযরত আলীর (রাঃ) খেলাফতের যুগ শেষ হলে উম্যাইয়া বংশের লোকেরা খেলাফতের দায়িত্ব পালন আরম্ভ করেন। এরকমই এক শাসক ছিলেন ইয়াযিদ ইবন মুআবিয়া। কিন্তু তিনি জড়িয়ে পড়েন ভয়ঙ্কর সব কেলেঙ্কারী ও অপরাধের সাথে।

এসব অন্যায় মেনে নিতে পারেননি আবদুল্লাহ ইবন হানজালা (রাঃ)। শুধু তিনি একাই নন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রাঃ) ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রাঃ) তো সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ইয়াযিদের বিরুদ্ধে। আবদুল্লাহ ইবন হানজালাও তাঁর আট ছেলেকে সাথে নিয়ে যোগ দিলেন ইবনে যুবায়েরের সাথে।

একসময় ইয়াযিদের বাহিনী আক্রমণ করল মদীনা। আবদুল্লাহ ইবন হানজালা মদীনাবাসীদের নেতৃত্ব দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। অসংখ্য মদীনাবাসী সেদিন ইসলামের উপর টিকে থাকতে গিয়ে শাহাদাতবরণ করলেন।

একের পর এক শহীদ হয়ে গেলেন বীরকেশরী আবদুল্লাহ ইবন হানজালার আটটি ছেলেই। নিজ চোখে দেখলেন তিনি ছেলেদের শাহাদাত। এবার তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন। গায়ে তাঁর উহুদের শহীদ হানজালার (রাঃ) রক্ত রাঙা পোষাক। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি দুশমনের মোকাবিলায়। আরও একবার রক্তে রঙিন হল সেই পোষাক। শহীদ হয়ে গেলেন তিনি।

বাবা হানজালা আর আট ছেলের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আবদুল্লাহ যাত্রা করলেন জান্নাতের পথে। তিন পুরুষের বসতি গড়ে উঠল জান্নাতের চিরসবুজ উদ্যানে।

www.pathagar.com

এসব মহান ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গর্ব করতো মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের লোকেরা। তারা বলতোঃ

আমাদের আছে হানজালা- যাঁকে ফিরিশতারা গোসল দিয়েছিল।

আসিম ইবন সাবিত- আল্লাহ যাঁর দেহ মৌমাছি ও ভীমরুল দিয়ে হেফাজত করেছিলেন।

খুযায়মা ইবন সাবিত- যাঁর একার সাক্ষ্য দুইজনের সাক্ষ্যের সমান।

আর আছে সা'দ ইবন উবাদা- যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। (আসহাবে রাসূলের জীবনকথা- ৩য় খন্ড)

এ ছিল সেইসব মর্দে মুজাহিদীনদের ইতিহাস, যাঁরা নিজেদের রক্ত দিয়ে ইসলামের সোনালী ইতিহাস রচনা করেছিলেন। যাঁরা দুনিয়ার শান-শওকত নয় আখেরাতের অফুরান বিলাসী জীবনকেই পছন্দ করেছিলেন হৃদয়ের সবটুকু কামনা দিয়ে।

আজও দুনিয়ার পথে প্রান্তরে জুলুমের প্রতিবাদে হানজালাদের উত্তরসূরীরা জান্নাতের নেশায় জিহাদ করছেন। শহীদ হয়ে বাড়িয়ে তুলছেন ইসলামের মর্যাদা। প্রমাণ করছেন কুরআনের সত্যতা। আর তাদের নিয়ে গর্ব করছেন তাদের সাথীরা। তাহলে আর দেরী কেন, চল, বন্ধু! আমরাও সাথী হয়ে যাই ঐসব সাহসী মুজাহিদদের।

অ্যাকশনে আবুবকর (রাঃ)

"আল্লাহ তার দ্বীনকে সম্পূর্ণ করেছেন" এ ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে। অর্থাৎ এ ঘোষণার পর ইসলামে তিনি যেমন নতুন কোন বিধান জুড়ে দেননি, তেমনি কোন বিধানই আর অস্বীকার সুযোগ রইলনা কারোর জন্যই। সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ- এ সবই যে ফরয, তা চিরকালের জন্য স্থায়ী হয়ে গেল মুসলমানদের জন্য।

এর কিছুদিন পরেই নবীজী দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। গোটা আরবের অধিকাংশ স্থানেই তখন মানুষ হয় মুসলমান হয়ে গেছে, আর নাহয় ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু আরবের মূর্খ বেদুইনরা ছিল বড় বেশী স্বাধীনতা প্রিয় এবং কৃপণ। নতুন যারা ইসলাম গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছে এবং আনুগত্য স্বীকার করেছে- এদের অধিকাংশই তখনো পর্যন্ত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পায়নি।

এরই মাঝে কিছু প্রতারক, চতুর লোক নিজেদের নবী বলে দাবী করে বসল। তারা মনে করেছিল, নিজেদেরকে নবী দাবী করে, কিছু আজগুবী কথা শোনালে বোধ হয় মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মত সম্মান- মর্যাদা পাওয়া যাবে।

প্রিয়নবীর মৃত্যুর খবরকে এরা কাজে লাগাতে চাইল। রটিয়ে দিলঃ দেখ 'মুসলমানদের নবী তো মারা গেলেন। আর নবী তো জীবিত।' অর্থাৎ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) থেকেও শ্রেষ্ঠ। এসব কথা বলে তারা মুসলমানদের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অন্য সবাইকে আহবান জানাল। মূর্খ বেদুইনরা তাদের এসব কথায় বেশ উৎসাহ বোধ করল।

আর কৃপণরা দেখল, ইসলাম তো ধর্ম হিসেবে ভাল। কিন্তু তা মানতে গেলে যে, কষ্ট করে আয় করা অর্থ যাকাত হিসেবে দিয়ে দিতে হবে! তা কি করে হয়! সুতরাং যাকাত দেয়া যাবে না। যাকাতের বিধানকে অস্বীকার করতে হবে। এমনকি এজন্য তারা মুসলিম খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি পর্যন্ত নিয়ে ফেলল। তারা ঘোষণা করলঃ মদীনার খলীফার যাকাত আদায়ের অধিকার নেই।

ওদিকে প্রিয়নবীর জীবনের শেষ নির্দেশ ছিল উসামা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সামরিক অভিযান। প্রিয়নবীর ওফাতের পরপরই আবুবকর (রাঃ) উসামা (রাঃ)-এর নেতৃত্বে অভিযান পাঠিয়ে ছিলেন। জিহাদের গুরুত্ব শুধু যে প্রিয়নবীর কাছেই ছিল, তা কিন্তু নয়। বরং সাহাবীদের প্রত্যেকেই জিহাদের মর্যাদা ও ফজীলাত সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। তাই সামর্থ্যবান সাহাবীরাও সাথী হলেন উসামার। তাই মদীনায় তখন যুদ্ধ করার মত সাহাবীর সংখ্যা খুবই কম।

ভন্ডনবী আর যাকাত অস্বীকারকারীরা এত দ্রুত বিদ্রোহ ঘোষণা করল যে, নবীন খেলাফতের জন্য এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। আরও মুশকিল হল যখন দুশমনদের একটা বড় অংশ সম্মিলিত বাহিনী গড়ে তুলে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা প্রস্তুতি নিল।

বিভিন্ন স্থান থেকে বিদ্রোহের খবর আসতে লাগল খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে। এসব শুনে কিন্তু খলীফা এতটুকু ভেঙ্গে পড়লেন না। বললেনঃ সব এলাকায় আমাদের নিয়োগকৃত শাসকদের কাছ থেকে পূর্ণ রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হল না। কয়েকদিন পরেই বিভিন্ন এলাকা থেকে রিপোর্ট আসতে লাগল। এসব রিপোর্ট থেকে জানা গেলঃ বিদ্রোহীদের হাতে শুধু দেশই বিপদের মধ্যে নয়, বরং যারা ইসলামের উপর টিকে থাকতে চায়, তাদের জীবনও ঝুঁকির মধ্যে।

www.pathagar.com

অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল পরিস্থিতি। এ অবস্থায় বিদ্রোহীদের পূর্ণ শক্তি দিয়ে দমন করা এবং যে কোন মূল্যে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রনে আনা ছাড়া খলীফার হাতে কোন বিকল্প ছিল না।

মদীনার আশেপাশে ছিল আবাস ও জুবিয়ান গোত্র। এরাও যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসল। মুসলমানদের জন্য এসব গোত্রের সাথে সম্পর্ক ছেদের ব্যাপারটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদের বিরুদ্ধে সামরিক সিদ্ধান্ত নেয়াও খুব সহজ ছিল না এ পরিস্থিতিতে।

কিন্তু পরিস্থিতি এত খারাপ হয়ে পড়ল যে, মুসলমানদের সামনে খোলা রইল মাত্র দুইটি পথ। একঃ যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে যাকাত দিতে বাধ্য করার চেষ্টা না করা। নমনীয়তা ও ভদ্রতার সাথে আচরন করে বুঝিয়ে-শুনিয়ে এদেরকে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী করা।

দুইঃ এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। দ্বিতীয় পথ ধরলে তো দুশমনের সংখ্যা বাড়বে অনেক, আবার যুদ্ধ করার মত সামর্থ্যবান মুজাহিদও তো নেই মদীনায়। কি করবেন এখন আবুবকর (রাঃ)?

পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি বড় বড় সাহাবীদের নিয়ে বসলেন। উমার (রাঃ)-সহ অধিকাংশ সাহাবী মত দিলেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা মোটেও ঠিক হবে না।

সাহাবারা এও বললেনঃ এসব গোত্রকে সাথে নিয়ে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এসব মতের বিপক্ষেও কয়েকজন মতামত দিলেন। আলোচনা চলল অনেক অনেকক্ষণ ধরে। সবশেষে খলীফা বক্তব্য দিলেন। তিনি স্পষ্টতঃই যাকাতের উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে দ্বিতীয় মতের পক্ষে মত দিলেন। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে যুদ্ধ করে যাকাত দিতে বাধ্য করা হবে। এ ব্যাপারে তিনি এত কঠোর ছিলেন যে, বলেই ফেললেনঃ

'আল্লাহর কসম! যারা রাসূল (সাঃ)-এর যুগে একটি রশিও যাকাত হিসেবে দিত, তারা যদি আজ তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি এ যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।'

একথা শুনে অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ উমার (রাঃ) পর্যন্ত বলে উঠলেনঃ "আমরা তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারি, যেখানে আল্লাহর রাসূল পরিস্কারভাবে বলেছেনঃ আমাকে তখনই মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যখন কোনো লোক কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' মুখে উচ্চারণ না করবে। যে ব্যক্তি এ কালেমা মুখে বলবে, তখন তার জীবন ও সম্পদের হেফাজত করার দায়িত্ব হবে মুসলমানদের। অবশ্য তার উপর যা ফরয হবে, তা

www.pathagar.com

পরিশোধের জন্য তার কাছে দাবী জানাতে হবে। তবে তার নিয়াতের হিসাব আল্লাহ নিজেই তার কাছ থেকে নেবেন।"

কিন্তু উমার (রাঃ)-এর এমন যুক্তিনির্ভর বক্তব্যও আবুবকর (রাঃ)-এর উপর এতটুকু প্রভাব ফেলতে পারল না। তিনি সরাসরি বললেনঃ

"আল্লাহর কসম! আমি সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী লোকদের সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করবো। কারণ, যাকাত হলো ধন-সম্পদের হক। তিনি প্রিয়নবীর হাদীস উল্লেখ করে বললেনঃ ইসলাম গ্রহণকারীদের দায়িত্বে যে 'হক' আসবে, তা সব অবস্থাতেই তার কাছ থেকে আদায় করার জন্য চাইতে হবে।"

এ বক্তব্যের পর উমার (রাঃ) নিজের মত থেকে সরে এসে খলীফার পাশে দাঁড়ালেন। বললেনঃ "আবুবকর (রাঃ)-এর জবাব শুনে আমার এ বিশ্বাস জন্মালো যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ আবুবকর (রাঃ)-এর অন্তর খুলে দিয়েছেন।"

ইসলামের ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। প্রিয়নবীর যুগের এমন ঘটনা ঘটেছে। তায়েফ থেকে সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল এল ইসলাম গ্রহণের জন্য। তারা বলেছিলঃ "আমাদের জন্য সালাত মাফ করে দেয়া হোক।"

আল্লাহর রাসূল সরাসরি তাদের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেনঃ 'ঐ দ্বীনে কোন কল্যাণ নেই, যে দ্বীনে সালাত নেই।'

রাসূল (সাঃ)-কে অনুসরণ করে চলাটাই আবুবকর (রাঃ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করলেন। বললেনঃ 'আল্লাহর কসম! আমি সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।'

দুশমন কিন্তু বসে রইল না। তারা রীতিমতো যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে এল। শুধু আবাস ও জুবিয়ান গোত্রই নয়, তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল বনু কিনানা, গাতফান ও ফাজারা গোত্রের লোকেরা। তারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে মদীনার দিকে অবস্থান নিল।

দুশমনের একদল প্রতিনিধি এল মদীনায়। লোক মারফত খলীফার কাছে প্রস্তাব পাঠালোঃ 'তারা সালাত আদায় করতে রাজী। কিন্তু তাদের যাকাত থেকে মাফ করে দিতে হবে।'

একথা শুনে আবুবকর (রাঃ) উমারকে যে জবাব দিয়েছিলেন, সে একই জবাব এদেরকেও দিলেন। অর্থাৎ তারা যদি একটি রশি পরিমাণ যাকাত দিতেও অস্বীকার করে, তবে তিনি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেবেন।

প্রতিনিধি দল হতাশ হয়ে ফিরে গেল। কিন্তু মদীনায় তারা যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে, মদীনার অবস্থা এখন খুবই দুর্বল। বাইরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার মত শক্তি মদীনার নেই। ওরা

www.pathagar.com

জানত না, মুসলমান কখনও দুর্বল হয়না। প্রতিটি মুসলমানই এক একজন নওজোয়ান মুজাহিদ। বয়স, পরিস্থিতিকে তাঁরা পাত্তাই দেননা।

বলাবাহুল্য, তখন পর্যন্ত নিয়মিত কোন সেনাবাহিনী মুসলমানদের ছিল না। তাই কোন সেনা ছাউনীও মদীনায় ছিলনা। স্বাভাবিকভাবে মদীনায় বসবাসকারীরাই শুধু সেখানে ছিল।

সূক্ষ্মদর্শী আবুবকরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না দুশমনের মনের গোপন পর্যবেক্ষণ। প্রতিনিধিরা ফিরে যেতে না যেতেই মদীনাবাসীদের সমাবেশ ডাকলেন খলীফা। সবাই এলে বললেনঃ

"তোমাদের চারদিকে দুশমন ঘাঁটি বানিয়ে বসে আছে। তারা তোমাদের দুর্বলতাগুলোও বুঝে ফেলেছে। বলা যায় না, কোন সময় তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসে। মাত্র কিছুটা দূরে তাঁবুতে অপেক্ষা করছে তারা। তারা মনে করেছিল, তোমরা তাদের শর্ত মেনে নেবে। কিন্তু এখন আমরা তাদের শর্ত মানতে অস্বীকার করেছি। তাই তারা অবশ্যই তোমাদের উপর আক্রমণ করতে চাইবে। তোমরা নিজেরাও নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কর।"

এরপর তিনি আলী, জুবাইর, তালহা ও আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের নেতৃত্বে ছোট ছোট দল বানিয়ে বাইরের রাস্তার উপর অবস্থান নেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। অন্যান্য সকলকে মসজিদে নববীতে এসে যুদ্ধ প্রস্তুতির আদেশ দিলেন। সেইসাথে গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দিলেন মদীনার আশেপাশে। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মূল কমান্ড নিজের হাতেই রাখলেন অতি বিনয়ী বলে পরিচিত খলীফা আবুবকর (রাঃ)। অথচ তাঁরও বয়স তখন প্রায় ষাট বছর।

খলীফার আশঙ্কা ভুল ছিল না। মাত্র তিন দিনের মাথায় আক্রমণ করে বসল দুশমন। তাদের ইচ্ছা ছিল, খলীফার কাছ থেকে তাদের দাবী আদায় করে তবে ছাড়বে। ওদের প্রস্তুতির খবর কমান্ডারদের মাধ্যমে খলীফার কাছে যথাসময়েই পৌঁছুল।

তিনি কমান্ডারদের প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সতর্কতার সাথে প্রতিরোধ করার নির্দেশ দিলেন। আর নিজেরা উট নিয়ে মসজিদে নববীতে এসে দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে তুললেন। প্রস্তুতি শেষ হল রাতের আঁধারে চুপি চুপি আসা দুশমনকে প্রতিরোধ করার। এ প্রস্তুতিটা হল অত্যন্ত গোপনে, দুশমন টেরই পেল না।

মুসলমানরা কোন রকম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, এমন চিন্তা মাথায় আনেনি দুশমন। ওরা মদীনা থেকে আসা দুর্বলতার রিপোর্টকেই চূড়ান্ত মনে করেছিল। আক্রমণ করতে এসে ওরা পড়ে গেল একেবারে মুসলমানদের পাতা ফাঁদের ভিতর। সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পড়ে গেল

www.pathagar.com

দুশমন। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই আক্রমনের সাধ মিটে গেল দুশমনের। পালাতে লাগল ওরা। পিছু ধাওয়া করলেন মুসলমানরা।

মদীনা আক্রমনে আসার সময় দুশমনের বাহাদুর যোদ্ধারা অনেকেই আসেনি। কিন্তু তাড়া খেয়ে যখন দুশমন এলাকায় ফিরে গেল, তখনই বেরিয়ে এল বাহাদুররা। আরও একটি রাত কাটল তুমুল সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। চূড়ান্ত বিজয় কোন পক্ষই পেল না।

অবশেষে দুশমন মুসলমানদের উটের ঘাড় লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগল। উটগুলো ছিল সাধারণ। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ এগুলোর ছিল না। ভয়ে উটগুলো দিক পরিবর্তন করে ফিরে আসতে লাগল নিজ শহরের দিকে। সেইসাথে মুসলিম বাহিনীও ফিরে এল মদীনায়।

মুসলমানদের ফিরে যাওয়াকে দুশমন বিবেচনা করল পরাজয় হিসেবে। তাই তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে তাদের আরো সহযোগীরা চলে এল। দুই রাত্রির লড়াইয়ের পর তৃতীয় রাত্রিতে তারা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু আবুবকর (রাঃ) ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব। দুশমনের চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে তিনি বিশ্রাম নিলেন না। মদীনায় ফিরেই তিনি নতুন করে প্রস্তুতি নিলেন সারাদিন। অথচ আগের দুইটি রাত তাদেরও কেটেছে প্রচন্ড লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে।

দিন শেষে নেমে এল রাতের আঁধার। আবুবকর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মদীনার মুজাহিদরা বেরিয়ে পড়লেন রাতের শেষ তৃতীয়াংশে। তাদের এই অভিযান জানতে পারল না কাক-পক্ষীও। যখন ভোর হল, দেখা গেল মুজাহিদ এবং দুশমন একই ময়দানে রয়েছে।

কিন্তু পার্থক্য এতটুকুই যে, মুসলমানরা সম্পূর্ণ রণপ্রস্তুতিতে, আর দুশমন আয়েশের বিছানায়। চমৎকার সুযোগ মুজাহিদদের সামনে। কোনরকম সুযোগ না দিয়ে তারা নির্দ্বিধায় দুশমনের উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালালেন। বাহাদুর বীর যোদ্ধারা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যেই মারা পড়তে লাগল। কিছু দুশমন অবশ্য সামান্য প্রতিরোধের চেষ্টা করল। তাদের সে চেষ্টা আক্রমণের তীব্রতায় উড়ে গেলো।

যারা পালাতে চাইল, তাদের পিছু ধাওয়া করা হল বহুদূর পর্যন্ত। যখন দেখা গেল, দুশমনের আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই, তখনি ময়দানে ফিরে এলেন মুজাহিদরা। কয়েকজন কমান্ডারকে দলবলসহ রেখে খলীফা ফিরে এলেন মদীনায়।

ঐতিহাসিকরা এ যুদ্ধকে তুলনা করেছেন বদরের যুদ্ধের সাথে। বদরের প্রান্তরে মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন, আর মুশরিক ছিল হাজারেরও বেশী। তেমনি এ ঘটনাতেও মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল খুবই

www.pathagar.com

কম। বিপরীতে দুশমনের সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশী। বদরের বিজয় যে রকম প্রভাব ফেলেছিল, তেমনি জুলকিসসার ময়দানের এ যুদ্ধও প্রভাব ফেলেছিল সুদূরপ্রসারী।

অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, আবুবকর (রাঃ)-এর এই দৃঢ়তা নতুন কোন ব্যাপার নয়। তিনি ইসলামী জিন্দেগীর শুরু থেকেই প্রিয়নবীর পূর্ণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাকী জীবনে এ শপথের উপর ছিলেন অটল, অবিচল।

জীবনের কোন স্বাদ-আহলাদ, ভয়-ভীতি কোন কিছুই তাঁকে ইসলাম থেকে দূরে সরাতে পারেনি। তাঁর মত একজন দৃঢ়চেতা নেতা কিভাবে আল্লাহর হুকুমের বিরোধী বিষয়ের সাথে আপোষ করতে পারেন? যখনই কোন আপোষের প্রসঙ্গ এসেছে, তখনই তাঁর মনে পড়ে যেতো প্রিয়নবীর কথা। যেমনটি কুরাইশদের আপোষ-মীমাংসার প্রশ্নে প্রিয়নবী বলেছিলেনঃ

"আল্লাহর কসম! যদি এ লোকেরা সূর্যকে আমার ডান হাতে, চাঁদকে আমার বাম হাতে তুলে দেয়; আর চায় আমি ঐ কাজ ছেড়ে দেই, যে কাজ করার জন্য আল্লাহ আমার উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। তারপরও আমি তা থেকে এতটুকু দূরে সরতে পারব না। আমি হয় তাদেরকে আমার পথে আনবো আর তা নাহলে আমার সাধনায় আমি জীবন দেবো।"

আবুবকরের দৃঢ়তার কারণে যেসব দুর্বল ঈমানদার মনে করেছিল যাকাত না দিলেও চলবে, তারা দলে দলে এসে যাকাত জমা দিতে লাগল বায়তুল মালে। মদীনাবাসীরাও তাদের আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানালেন। এটা ছিল মুসলমানদের সাহস ও উৎসাহ যোগানোর যুগ। চারিদিক থেকে বিপদের যে কালোমেঘ চেপে বসতে চাইছিল, তাতে মুসলমানদের প্রয়োজন ছিল শক্ত আশ্রয়ের।

এ সময়ের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। তিনি বলেনঃ

"আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুর পর আমরা এমন একটি অবস্থায় পড়ে গেলাম, যদি এ সময় আল্লাহ আবুবকর (রাঃ)-র মাধ্যমে আমাদের সাহায্য না করতেন, তাহলে আমাদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। আমাদের সকল মুসলমানের মত ছিল, যাকাতের উটের জন্য আমরা যুদ্ধ করবো না। আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে আমার বিজয় অর্জন করবো।

কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আবুবকর (রাঃ) দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করলেন। যাকাত অস্বীকারকারীদের কাছে তিনি শুধু দু'টো শর্ত দিলেন, তিনটিও নয়। এক. তারা নিজেদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা কবুল করে নেবে। যদি তাতে রাজী না হও, তাহলে বহিস্কার বা যুদ্ধের জন্য তৈরী হও।

www.pathagar.com

নিজেদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা কবুল করার অর্থ হলো, তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তাদের নিহতরা জাহান্নামী আর আমাদের নিহতরা জান্নাতী হবেন। তারা আমাদের রক্তপণ আদায় করবে। আমরা তাদের কাছ থেকে যে সম্পদ পেয়েছি, তা ফেরতের দাবী করতে পারবে না। আর যে মাল তারা আমাদের কাছ থেকে পেয়েছে, তা আমাদেরকে ফেরত দিতে হবে।

বহিস্কারের শাস্তির অর্থ হলো- পরাজিত হবার পর নিজ নিজ এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। দূরে বহুদুরে গিয়ে বাস করতে হবে।"

আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর এ মন্তব্য থেকে বুঝা যায় যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে খলীফা কতটা কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন।

ওদিকে জুলকিসসার অভিযান শেষ হবার পর দুশমনের প্রতিটি গোত্র জ্বলে উঠল প্রতিশোধের আগুনে। আশেপাশের ঈমানদার মুসলমানদের তারা খুন করতে লাগল। এতে অবশিষ্ট মুসলমানরা ঈমান ত্যাগের পরিবর্তে আরও দৃঢ়ভাবে ইসলামের উপর টিকে থাকার চেষ্টা করতে লাগলেন। জুলুমের স্বল্পস্থায়ী এই ঝড়ে প্রচুর মুসলিম নামধারী মুসলিমের হাতে শহীদ হয়ে গেলেন।

মজলুম মুসলমানরা আবুবকরের দৃঢ়তায় বুঝতে পেরেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই এসব জালেমদের উপর বিজয় লাভ করবেন। তাদের উপর জুলুম শেষ হবে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, মজলুমের রক্তের কঠিন মূল্য আদায় নিশ্চয়ই করবেন খলীফা।

খলীফার প্রতি তাদের এই বিশ্বাস ছিল বাস্তবভিত্তিক ব্যাপার। খলীফা ছিলেন সময়ের অপেক্ষায়। কিছুদিনের মধ্যেই উসামা (রাঃ) ফিরে এলেন বিজয় আর যাকাতের অর্থ নিয়ে। মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। তারা শুকরানা সালাত আদায় করলেন।

অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে খলীফা আবার যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। দুশমনকে কোনরকম সুযোগ না দিয়ে নতুন করে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। উসামার বাহিনীকে বিশ্রামে রেখে তাজাদম মুজাহিদদের সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মজলুম ও শহীদ মুসলমানদের রক্তের বদলা নিতে।

বহু সাহাবী তাঁকে পরামর্শ দিলেন, নিজে না গিয়ে অন্য কাউকে কমান্ড দেয়ার জন্য। অনেকেই বললেন, আপনার যদি কিছু হয়, তবে খেলাফত মারাত্মক সমস্যায় পড়ে যাবে। কিন্তু তিনি তাঁর সংকল্পে অনড়। শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শের জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ

"আল্লাহর কসম! অবশ্য অবশ্যই আমি পেছনে থাকবো না। বরং তোমাদের সাথে সাথে থেকে তোমাদের উৎসাহ দেব ও সাহস যোগাবো।"

www.pathagar.com

মদীনা থেকে রওনা হয়ে আবুবকর (রাঃ) আবরক নামক স্থানে পৌঁছুলেন। এ স্থানটি ছিল জুলকিসসার কাছেই। ওখানে যাকাত অস্বীকারকারীদের সম্মিলিত বাহিনীর মুকাবিলা হল। চরম পরাজয় বরণ করে নিল দুশমন। খলীফা তাদেরকে ঐ এলাকা থেকে বের করে দিলেন। গোটা আবরক এলাকা মুসলমানদের সম্পদ বলে ঘোষণা করে দিলেন তিনি।

এভাবে তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদের সমূলে ধ্বংস করে দিলেন। তাদের ভিতর যারা বেঁচে রইল তারা গিয়ে যোগ দিল ভন্ডনবীদের সাথে। তারাও পরবর্তী অভিযানগুলোতে মারা পড়ল। এভাবে বিশ্বাসঘাতকদের নির্মূল করে ফেললেন খলীফা আবুবকর (রাঃ)।

প্রতিটি ক্ষেত্রে আবুবকর (রাঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একটিই। আর তা হলোঃ রাসূল (সাঃ)-এর কায়েম করা পদ্ধতি মত চলতে হবে। তিনি তাঁর সকল শ্রম-সাধনা ওয়াকফ করেছিলেন এ উদ্দেশ্যের পেছনে। তাঁর খেলাফতকালে তিনি এ আদর্শ মেনেছেন অত্যন্ত কঠোরভাবে।

(হযরত আবুবকর, ইবনে হায়কল, আধুনিক প্রকাশনী)

দুশমনকে কোন সুযোগ দিতে রাজী ছিলেন না আবুবকর (রাঃ)। দুশমন চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার পর সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি। অথচ তিনি ছিলেন প্রিয়নবীর সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে নরম হৃদয়ের একজন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সত্যিই একজন নরম প্রকৃতির মানুষ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইসলামের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। এজন্য তিনি কোন দিন কোন শক্তির সাথে এতটুকু আপোষ করেননি।

ইসলামে আপোষকামীতার স্থান নেই। খেলাফত দায়িত্ব পাওয়ার পর এ সত্যটিই প্রমাণ করেছেন আল্লাহর রাসুলের নিকটতম সাহাবী সিদ্দিকে আকবর হযরত আবুবকর (রাঃ)। ইসলামী আদর্শ পতাকাবাহী সংগঠনের দায়িত্বশীলদের জন্য তিনি এক অনুপম মডেল। যাঁরা আজও ইসলামের পতাকাকে তুলে ধরতে চান, তাঁদের জন্য তিনি হয়ে আছেন প্রেরণা উৎস। আদর্শের প্রশ্নে তাঁদেরকেও হতে হবে অত্যন্ত কঠোর ও অনমনীয়।

www.pathagar.com

প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর সময় ইসলামের মুজাহিদরা বিভিন্ন কারণে সে যুগের দুই বিশাল শক্তিধর রাষ্ট্র রোম ও ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এ সময়ে মুজাহিদরা যে অসামান্য ত্যাগ ও রণনৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, তার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই।

আল্লাহর তরবারী নামে খ্যাত হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ ছিলেন এ সময়ের সবচাইতে আলোচিত সেনানায়ক। তিনি-ই প্রথম ইরানের ময়দানে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এ সিরিজের ২য় খন্ডে ইরানে তার অভিযানের কথা তুলে ধরেছি।

খালিদ (রাঃ) ইরানের ময়দানে জয়লাভ করেই সেসব স্থানে ইসলামের শাসন কায়েম করতেন। সেই যুগে বিজয়ী সেনাবাহিনীর সৈনিকেরা অকথ্য নির্যাতন চালাত পরাজিত জনপদে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরপরই মুজাহিদরা সম্পূর্ণ বদলে যেতেন। যুদ্ধের ময়দানের রুক্ষতার স্থানে তাদের আচরণে প্রকাশ পেত ইসলামের স্বভাব সুলভ দয়া, ক্ষমা আর উদারতা।

তাই যেসব এলাকায় উড়ত ইসলামের বিজয় পতাকা, সেসব এলাকাবাসীরা মুজাহিদদের ভূয়সী প্রশংসা করত। কিন্তু ইরানের শাসকেরা ততদিনে মুসলমানদেরকে নিজেদের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেছিল। ওরা বুঝতে পেরেছিল, মুজাহিদদের যদি সময়মত প্রতিরোধ করা না যায়, তবে তাদের জুলুমের দিন শেষ। তাই মুজাহিদদের প্রকৃত ভূমিকা আড়াল করে একরাশ মিথ্যা, বানোয়াট অভিযোগ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিত।

কিন্তু মিথ্যা অভিযোগ, ক্ষমতার দাপট কি পেরেছিল হযরত খালিদের (রাঃ) দুরন্ত গতিকে কমিয়ে দিতে? পারেনি।

দজলা ও ফোরাত ইরানের দু'টি বিখ্যাত নদী। এ নদী দু'টির তীরেই গড়ে উঠেছিল ইরানের বড় বড় নগরী। হযরত খালিদের নেতৃত্বে এগিয়ে আসা মুজাহিদদের অভিযানকে ঠেকিয়ে দেয়ার জন্য ইরানী সেনাবাহিনী-ই যথেষ্ট; এ কথা মনে করত ঐ এলাকার মানুষেরা। কিন্তু হযরত খালিদের অসামান্য রণনৈপুণ্য আর বীরত্বের কথা জেনে তারাও কেঁপে উঠত অজানা শঙ্কায়।

www.pathagar.com

ইরানী সম্রাট নিজেও বুঝতেন পরিস্থিতির ভয়াবহতা। তাই যেসব ইরানী সেনাপতি, স্থানীয় সরদার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অতি উৎসাহী ছিল, তাদের ডেকে পাঠালেন রাজধানী মাদায়েনে। নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে গেল ইরানী নেতারা। ইরানের এক অভিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ সেনাপতি ছিলেন বাহমান জাযবিয়া। তিনিও আসছেন অন্যদের পেছন পেছন।

ইরানীদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন খালিদ (রাঃ)। তিনি তখন ছিলেন 'মাজার' নামক একটি এলাকায়। যেসব এলাকায় মুজাহিদ কমান্ডাররা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন, তাঁদেরকে সতর্ক করে দিলেন তিনি। অতীতে অনেক বড় বড় বিজয় এসেছে- এখন দুশমন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না- এমন ধারণা যেন তাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়।

দুশমনকে কোন রকম সুযোগ দিতেন না তিনি। নিজেই এগিয়ে গেলেন খালিদ 'ওয়ালজা'র দিকে, যেখানে যৌথ বাহিনী পৌঁছে গেছে। দুশমনের সামনেই অবস্থান নিলেন তিনি। যেহেতু সাহসে, বীরত্বে দুই পক্ষই সমানে সমান, তাই দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ চললো।

কিন্তু এ দৃশ্য দেখার মত ধৈর্য ছিল না খালিদের। তিনি দু'জন কমান্ডারকে নির্দেশ দিলেনঃ বাহিনী নিয়ে তারা যেন দুশমনের পেছনে হাজির হয়। উদ্দেশ্য হলো, দুশমনকে পেছন থেকে আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া।

যুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু কমান্ডাররা যথাসময়ে পেছনে অবস্থান নিতে পারলেন না। ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ চালাতে পারলেন না খালিদ। ফলে স্বাভাবিক গতিতে যুদ্ধ হলো। কেউই বিজয় অর্জন করতে পারল না। একসময় যুদ্ধ মূলতুবী করে ইরানীরা শিবিরে ফিরে গেল।

ঠিক এসময় বেরিয়ে এলেন লুকিয়ে থাকা কমান্ডাররা। নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইরানীদের উপর। ইরানীরা আগেই মুসলমানদের তলোয়ারে গতি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল, এবার হঠাৎ বিপদ দেখে আর নিজেদেরকে ঠিক রাখতে পারল না ওরা। সাহস হারিয়ে ফেলল।

ঠিক এমনি সময় খালিদ সামনে থেকে চূড়ান্ত হামলা চালালেন ওদের উপর। দুশমন পুরো ঘেরাওয়ের মাঝে পড়ে গেল। পাইকারী হারে মারা পড়ল ইরানীরা। পুরো বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আক্রমণের তীব্রতায়। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেল ইরানী সেনাপতি বাহমান।

অতীতের মতো আরো একটি বিজয় অর্জন করলেন আল্লাহর তরবারী হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ (রাঃ)। অতীতের মতো এবারও তিনি বিশ্রাম নিতে অপেক্ষা করলেন না। এগিয়ে গেলেন আরো সামনে। আগামী খন্ডে আমরা সেসব কাহিনী তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

অভ্যর্থনা

ইরান জয় করেছেন মুসলিম বীর মুজাহিদরা। এর বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। ইরানের সেই সময়ের রাজধানী ছিল মাদায়েন। খলীফা উমার (রাঃ) সেখানে গভর্ণর হিসেবে পাঠালেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-কে।

হুজাইফা ছিলেন জিহাদের ময়দানের এক দুর্ধর্ষ কমান্ডো মুজাহিদ। আল্লাহর রাসূলের প্রতি ছিল প্রচন্ড ভক্তি ও ভালবাসা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন খুবই সাদাসিধা। এমনকি একটি অতি সমৃদ্ধ নগরীর শাসক ঘোষিত হওয়ার পরও তার জীবনে সামান্য পরিবর্তনও আসেনি।

শাসনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি চলেছেন মাদায়েনের উদ্দেশ্যে। এ খবর আগেই পৌঁছুল সেখানে। মাদায়েনবাসীরা দারুণ কৌতুহল নিয়ে বেরিয়ে এল শহরের বাইরে। অভ্যর্থনা জানাতে চায় তাদের নতুন শাসককে।

হুজাইফা (রাঃ)-এর তাকওয়া, আল্লাহর প্রতি ভয়, সরলতা, সাহসিকতার অনেক গল্পই তারা শুনেছে। আজ সেই মহান ব্যক্তিত্বকে তারা বরণ করে নিতে চায়।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তারা, কখন একটি কাফেলা দেখা যাবে খোলা ময়দানে। যে কাফেলায় থাকবে প্রচুর লোকজন, শান-শওকত। থাকবে উট বোঝাই রসদ, আরও কত কি!

কিন্তু তাদেরকে সম্পূর্ণ হতাশ করে এগিয়ে এল একটি গাধা। গাধার পিঠে বসার আসনটিও অতি পুরানো। সেখানে বসে আছেন সাদাসিধা পোষাকের এক ব্যক্তি। চেহারায় দারুণ এক উজ্জ্বলতা। গাধার পিঠে বসে এক হাতে রুটি ও অন্য হাতে লবণ ধরে আছেন। মাঝে মাঝে চিবুচ্ছেন সেই রুটি।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সওয়ার, পৌঁছুল গিয়ে জনতার মাঝে। লোকেরা খুব ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে পারল ইনিই সেই গভর্ণর, যার অপেক্ষায় তারা এতক্ষণ ছিল। এই প্রথমবারের মত তাদের কল্পনা হোঁচট খেল। গোটা পারস্য সাম্রাজ্যে এমন শাসককে তারা এর আগে আর কখনও দেখেনি।

হুজাইফা (রাঃ) এগিয়ে চললেন। সাথে সাথে জনতা। গভর্ণর হাউসে পৌঁছে তিনি পড়ে শোনালেন খলীফার ফরমান (নিয়োগপত্র)। খলীফা হযরত উমারের নিয়ম ছিল, নতুন গর্ভণর বা শাসক নিয়োগের সময় সেই এলাকাবাসীদের প্রতি বিভিন্ন নির্দেশ ও গভর্ণরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে বলে দেয়া।

কিন্তু হযরত হুজাইফার নিয়োগ পত্রে মাদায়েনবাসীর প্রতি শুধু একটিই নির্দেশ ছিলঃ 'তোমরা তাঁর কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে।' এ থেকেই বুঝা যায়, কত বড় মাপের ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

হুজাইফা (রাঃ) সেই নির্দেশ পড়ে শোনালেন। তখন চারদিক থেকে আওয়াজ উঠলঃ বলুন, আপনার কি প্রয়োজন? আমরা সবই দিতে তৈরী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের অনুসারী হুজাইফা (রাঃ) বললেনঃ 'আমার নিজের পেটের জন্য কিছু খাবার, আর আমার গাধাটির জন্য কিছু ঘাস-খড় প্রয়োজন। যতদিন এখানে থাকবো, তোমাদের কাছে শুধু এতটুকুই চাইবো।'

উপস্থিত জনতাকে আরও বললেনঃ 'তোমরা ফিতনার জায়গাগুলো থেকে দূরে থাকবে।'

লোকেরা জানতে চাইলোঃ 'ফিতনার জায়গা কোনগুলো?'

তিনি বললেনঃ 'গভর্ণর বা শাসকদের বাড়ির দরযা। তোমাদের কেউ শাসকের কাছে এসে মিথ্যা বলে তাকে সম্বোধন করবে আর তার মধ্যে যা নেই, তাই বলে তার প্রশংসা করবে (অর্থাৎ তোষামোদ বা মুসাহেবী করবে)- এটাই আসল ফিতনা।'

এভাবেই শুরু হল তাঁর গভর্ণর হিসেবে নতুন মিশন। তিনি শাসক ছিলেন এমন এক রাজ্যের, যে রাজ্যের লোকেরা ছিল তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী। প্রজাদের মধ্যে ছিল উন্নত শিক্ষা, আভিজাত্যের অহঙ্কার, ছিল সমৃদ্ধ ইতিহাস আর বিশাল বিত্ত-বৈভব।

কিন্তু এসবের কোন কিছুই আকর্ষণ করতে পারেনি হুজাইফাকে। তিনি ছিলেন দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক শাসক। মাদায়েনের সম্পদ তাঁর হৃদয়ে সামান্য প্রভাবও ফেলতে পারেনি। তিনি জীবনের প্রয়োজনে নূন্যতম খাবার ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতেন না। সেই গাধাটিই ছিল তার একমাত্র বাহন। অথচ তিনি চাইলেই উন্নত ও দামী বাহন ব্যবহার করতে পারতেন।

একবার খলীফা তাঁর কাছে কিছু অর্থ পাঠালেন। সাথে সাথে তিনি সবই মানুষের মধ্যে দান করে দিলেন। তবে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতকে সমান চোখে দেখতেন। তিনি বলতেনঃ তোমাদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে ভাল নয়, যারা আখিরাতের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করেছে। আবার তারাও নয়, যারা দুনিয়ার জন্য আখিরাত ছেড়ে দিয়েছে। বরং যারা এখান থেকে কিছু এবং ওখান থেকে কিছু গ্রহণ করে তারাই আসলে সবচেয়ে ভালো।

তাই লোকদের হালাল উপায়ে আয় করার জন্য খুবই তাগিদ দিতেন। একবার তিনি লোকদেরকে বললেনঃ 'ওহে লোকেরা! তোমরা তোমাদের দাসদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখ। দেখ, তারা কোথা থেকে কিভাবে আয় করে তোমাদের নির্ধারিত মজুরী পরিশোধ করছে। কারণ, হারাম উপার্জন খেয়ে দেহে যে গোশত তৈরী হয়, তা কক্ষণো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর এটাও জেনে রাখ, মদ বিক্রেতা, ক্রেতা ও তাঁর প্রস্তুতকারক, সকলেই তা পানকারীর সমান।'

www.pathagar.com

শাসক হিসেবে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু এরপরেও সুযোগ পেলেই তিনি বসে যেতেন শিক্ষার আসরে। সে সময়ের শিক্ষা তো আর আজকের মত স্কুল-কলেজে হতো না। সেই সময়ের মূল শিক্ষা কেন্দ্র ছিল মসজিদ। হুজাইফা (রাঃ) সুযোগ পেলেই কুফার মসজিদে হাদীসের শিক্ষা আলোচনা করতেন, হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেনঃ 'আমাদের ওপর এই ইলমের (জ্ঞানের) দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা তোমাদের কাছে তা পৌঁছাবো- যদিও তার ওপর আমরা আমল না করি।'

ছাত্ররাও তাঁকে প্রচন্ড রকম শ্রদ্ধা করত। একবারের ঘটনা। বাশকারী নামক এক ব্যক্তি এক মসজিদে গিয়ে দেখেনঃ 'গোটা মজলিস নিরব এবং একই ব্যক্তির দিকে সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে।' বলা বাহুল্য সেই সম্মানিত ব্যক্তি হলেন হুজাইফা (রাঃ)।

এত উঁচু মাপের ব্যক্তিকেও কিন্তু খলীফা উমার (রাঃ) পরীক্ষা না করে ছাড়েননি। একবার তিনি হুজাইফাকে ডেকে পাঠালেন মদীনায়। হুজাইফাও রওনা হলেন মদীনার পথে। হুজাইফা আসছেন, এ খবর পেয়ে উমার (রাঃ) রাস্তার এক পাশে লুকিয়ে রইলেন। কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। বললেনঃ 'হুজাইফা, তুমি আমার ভাই, আর আমিও তোমার ভাই।'

তারপর আবার তাঁকে মাদায়েন ফিরে যেতে বললেন গভর্ণর হিসেবে। আসলে তিনি যাচাই করে নিলেন গভর্ণরের পদ হুজাইফাকে পরিবর্তন করে ফেলেছে কি-না! হুজাইফা (রাঃ) বহু বছর মাদায়েনে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

খলীফা উমার (রাঃ) সত্যিই তাঁকে খুব সম্মান করতেন, ভালবাসতেন। একবার খলীফা সম্মানিত সাহাবীদের এক আসরে বললেনঃ আচ্ছা আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছা-আকাঙ্খার কথা একটু বলুন তো! প্রায় সবাই বললেন, আমাদের একান্ত ইচ্ছা হলঃ আমরা যদি ধন-রত্নে ভরা একটি ঘর পেতাম, আর তার সবই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারতাম!

সবার শেষে উমার (রাঃ) বললেনঃ আমার বাসনা এই যে, আমি যদি আবু উবাইদাহ, মুয়াজ ও হুজাইফার মত মানুষ বেশী বেশী পেতাম, আর তাদের প্রশাসনের দায়িত্ব দিতে পারতাম।

একথা বলে তিনি এক থলে দিনার এক লোকের হাতে দিয়ে বললেনঃ 'এগুলি হুজাইফার কাছে নিয়ে যাও, আর তাকে বল, খলীফা এগুলি আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য পাঠিয়েছেন।' লোকটিকে আরো বলে দিলেনঃ 'তুমি একটু অপেক্ষা করে দেখবে, সে দীনারগুলো কি করে।'

লোকটি নির্দেশমত থলেটি নিয়ে হুজাইফার কাছে গেল। আর হুজাইফা সাথে সাথেই তা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

(আসহাবে রাসূলের জীবনকথা- ৩য় খন্ড)

www.pathagar.com

হাদীসের উস্তাদ আবু সাঈদ (রাঃ)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক সাহাবী হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ)। রাসূলের প্রতি ছিল তার দারুণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। মাত্র তের বছর বয়সেই তিনি চেয়েছিলেন জিহাদে ছুটে যেতে। কিন্তু অনুমতি পাননি।

এরপর পনের বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই তিনি ছুটে যেতেন জিহাদের ময়দানে। তিনি শুধু জিহাদের ময়দানের নিয়মিত মুজাহিদই ছিলেন না, তিনি কুরআন ক্লাসেরও একজন নিয়মিত ছাত্র ছিলেন। যে মহান সাহাবীরা জীবনের সবকিছু ত্যাগ করে আহলুস সুফফা হিসেবে নাম লিখিয়েছিলেন, আবু সাঈদ (রাঃ) ছিলেন তাঁদেরই একজন।

অভাবের তীব্রতায় তাঁরা গায়ে জড়াবার প্রয়োজনীয় কাপড়টুকু পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারতেন না। এমনকি ক্লাসে অংশ নেয়ার সময় একে অপরকে আড়াল করে বসতেন। এভাবেই তাঁরা জ্ঞান অর্জন করতেন। তিনি যে শুধু প্রিয়নবীর কাছ থেকেই হাদীস শিখতেন তা কিন্তু নয়। বরং তিনি অন্যান্য মহান সাহাবীর কাছ থেকেও হাদীস শিখতেন।

প্রিয়নবীর ইন্তেকালের পর হাদীসের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। তখন আবু সাঈদ (রাঃ) লেগে গেলেন নতুন এক সাধনায়। তিনি হাদীসের শিক্ষা প্রচারের কাজে হাত দিলেন। তার হাদীসের ক্লাস ছাত্রদের ভীড়ে জমজমাট থাকত। কোন প্রশ্ন করতে চাইলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হত জবাবের জন্য।

ক্লাসের বাইরেও তিনি হাদীস শোনাতেন, ফিকাহর মাসলা শেখাতেন। প্রশ্ন করলে জবাব দিতেন। একবার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছেলে আলী ও দাস আকরামাকে বললেনঃ 'যাও, আবু সাঈদের কাছ থেকে হাদীস শুনে এস।'

তারা যখন পৌছুলেন, আবু সাঈদ তখন বাগানে। তিনি তাদের নিয়ে সেখানেই বসে হাদীস শোনালেন। হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে ঐ হাদীসটি তিনি কিভাবে শুনেছিলেন, সে বর্ণনাও দিতেন।

সাহাবীরা হাদীস হিসেবে কোন কথা শুনলেই তা গ্রহণ করতেন না। বরং ঐ হাদীসটি সত্য কি-না তাও যাচাই করতেন। হাদীসের ব্যাপারে তারা সীমাহীন সতর্ক থাকতেন। একবার এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর সামনে আবু সাঈদের সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন।

www.pathagar.com

ইবনে উমার ঐ লোকটিকে সাথে নিয়ে আবু সাঈদের কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ এই ব্যক্তি অমুক হাদীসটি আপনার কাছ থেকে শুনেছে? আর আপনি কি তা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মুখ থেকে শুনেছেন?

আবু সাঈদ (রাঃ) বললেনঃ আমার দু'চোখ দেখেছে এবং দু'কান শুনেছে।

একবার এক ছাত্রের কাছে একটি হাদীস খুব ভালো লেগে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেনঃ হাদীসটি কি আপনি রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মুখ থেকে শুনেছেন?

এরকম প্রশ্নে তিনি একটু ক্ষুব্ধ হলেন। বললেনঃ তাহলে কি না শুনেই আমি বর্ণনা করেছি? হ্যাঁ, আমি শুনেছি।

আবু সাঈদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর উপদেশ মত ছাত্রদের আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাতেন। ছাত্র হিসেবে তাঁর কাছে কেউ গেলে, বলতেনঃ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) উপদেশের প্রতি স্বাগতম। নবী (সাঃ) বলেছেনঃ মানুষ তোমাদের অনুসরণ করবে। কিছু লোক বিভিন্ন জায়গা থেকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য তোমাদের কাছে আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তোমরা তাদের ভালো উপদেশ দেবে।

নবীজী আরও বলেছেনঃ তাদেরকে (ছাত্রদেরকে) শেখাবে এবং বলবে মারহাবা, মারহাবা, কাছে এস।

আবু সাঈদ (রাঃ) বলতেনঃ 'রাসুল (সাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন তাদের (ছাত্রদের) মজলিসে বসার জায়গা করে দিই, তাদের হাদীস শিখাই।' কারণ, তোমরাই তো আমাদের পরবর্তী প্রতিনিধি, আমাদের পরবর্তী মুহাদ্দিস।

তিনি তাঁর ছাত্রদের আরও বলতেনঃ তুমি কোন বিষয় না বুঝলে, তা বুঝার জন্য বার বার প্রশ্ন করবে। কারণ, তুমি বুঝে আমার মজলিস থেকে উঠে যাও- এটা তোমার না বুঝে উঠে যাওয়া থেকে আমার কাছে বেশী প্রিয়।

তিনি যেমনি হাদীসের উস্তাদ ছিলেন, তেমনি সত্যভাষী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তিনি বলতেনঃ আমি রাসূলকে (সাঃ) সত্য ভাষণের প্রতি জোর তাকীদ দিতে শুনেছি। হায়, যদি তা না শুনতাম।

একবার সত্য ভাষণের হাদীসটির আলোচনা উঠলে তিনি কেঁদে ফেলেন। তারপর বলেনঃ হাদীসটি তো অবশ্যই শুনেছি, কিন্তু তার ওপর তো মোটেও আমল হচ্ছে না।

আর একবারের ঘটনা। খলীফা মারওয়ানের দরবারে বসে সাহাবীদের ফজীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে তাকে হাদীস শোনালেন। মারওয়ান বিশ্বাস করতে চাইল না। সেখানে যায়িদ ইবন সাবিত ও রাফে ইবনে খাদিজও উপস্থিত ছিলেন। আবু সাঈদ প্রথমে তাদের দুইজনকে

www.pathagar.com

সাক্ষী মানলেন। তারপর বললেনঃ তাঁরাই বা কেন বলবে? একজনের তো সাদাকার চাকুরী হারানোর ভয় আছে, আর অপরজনের আপনার একটু ইঙ্গিতেই গোত্রের সরদারী চলে যাওয়ার ভয় আছে।

এমন স্পষ্ট বক্তব্য শুনে রাগে ফেটে পড়ল মারওয়ান। এমনকি বেত্রাঘাত করার জন্যও সে প্রস্তুতি নিল। তখন যায়িদ ও রাফে আবু সাঈদের বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে নিলেন।

একবার এক ব্যক্তি পবিত্র 'তুর' পাহাড় দেখতে যেতে চাইলেন। তিনি আবু সাঈদের সাথে দেখা করতে এলেন। আবু সাঈদ তাকে স্পষ্ট বলে দিলেনঃ **তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন পবিত্র জায়গার দিকে সফর নিষেধ করা হয়েছে।**

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল মানুষ। একবার একটি জানাযার জন্য তাঁকে ডাকা হল। সবার শেষে একটু দেরীতে পৌঁছুলেন তিনি। লোকেরা তাঁর অপেক্ষায় বসেছিল। তাঁকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য জায়গা খালি করে দিল। তিনি বললেনঃ 'এটা ঠিক নয়। মানুষের উচিত ফাঁকা জায়গায় বসা।' একথা বলে তিনি একটি ফাঁকা জায়গায় বসে পড়লেন।

বৌভাত

হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)। সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাতো বোন। মক্কার সবচাইতে সম্মানিত বংশ বনী হাশেমের মেয়ে তিনি। এই বনী হাশেম ছিল কা'বা ঘরের খাদিম। এ কারণে তারা এত উঁচু মর্যাদার আসনে ছিলেন, যে ইয়েমেনের রাজাও এতটা সম্মান আশা করতে পারত না।

ইসলামের প্রাথমিক পর্বে যাঁরা ঈমান আনার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, যায়নাব ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি হাবশায় হিজরতও করেছিলেন। এরকম একজন উঁচু মর্যাদার মহিলাকে আল্লাহর রাসূল বিয়ে দিলেন একান্ত স্নেহের যায়িদ ইবন হারিসা (রাঃ)-এর সাথে।

যায়িদের সম্মান ছিল একজন খাঁটি ঈমানদার হিসেবে। প্রিয়নবীর অত্যন্ত স্নেহভাজন হিসেবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের একজন সাহাবী হিসেবে। তিনি বহু সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেসব অভিযানে অংশ নিয়েছেন বড় বড় সাহাবীগণ।

www.pathagar.com

কিন্তু বংশ মর্যাদায় তিনি ছিলেন যায়নাবের থেকে অনেক পিছিয়ে। এত বিশাল মর্যাদা আল্লাহর নবী দেয়ার পরও সাধারণের মাঝে তিনি ছিলেন একজন দাস। এ অনুভূতি পোষণ করতেন স্বয়ং যায়নাবও। এ বিয়েতে তিনি এতটুকু রাজী ছিলেন না।

কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার যে তার সুযোগ নেই। তিনি তো একজন খাঁটি মুমিন মহিলা। তারপরও তিনি স্পষ্টতই প্রিয়নবীকে বলেছিলেনঃ যায়িদকে আমি পছন্দ করিনে।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা নাযিল করলেনঃ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন, তখন কোন মুমিন নারী-পুরুষের কোন রকম স্বাধীনতা থাকে না।" (আহযাবঃ ৩৬)

একরকম ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি এ বিয়েতে মত দিলেন। কিন্তু এ বিয়ে সফল হলো না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠল না। এক পর্যায়ে সম্পর্ক এতই তিক্ত হয়ে গেল যে, প্রিয়নবীর কানেও বিষয়টি পৌঁছালো।

তিনি বহু চেষ্টা করেও এ বিয়ে টেকাতে পারলেন না। যায়িদ (রাঃ) যায়নাবের ব্যবহার মেনে নিতে না পেরে তালাক দিয়ে দিলেন। যায়নাবের জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হল। কিন্তু আল্লাহ এ ঘটনার মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন তা মানুষ জানবে কি করে?

যায়নাব শৈশব থেকে বড় হয়েছেন প্রিয়নবীর কাছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। যায়িদের কাছ থেকে তালাক পাওয়ার পর প্রিয়নবী চাইলেন তাঁকে স্ত্রী হিসেবে পেতে। কিন্তু যায়নাব যে পালিত পুত্রের স্ত্রী। তাঁকে বিয়ে করলে মুনাফিক ও কাফিররা হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেবে, এমন আশঙ্কা ছিল খুব বেশী।

কিন্তু পালিত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে না করার রীতিটি ছিল জাহেলী যুগের। প্রয়োজন ছিল এ রীতির মূলোৎপাটন। তাই আল্লাহ তাঁর রাসূলকেই এ কাজের জন্য পছন্দ করেছিলেন। তাই আল্লাহতায়ালা নাযিল করলেনঃ

"তুমি মনের এমন কথা গোপন করে রাখছ, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আর তুমি মানুষকে ভয় করছ, অথচ আল্লাহকে ভয় করা তো তোমার জন্য আরও বেশী যুক্তিযুক্ত।" (আহযাবঃ ৩৫)

আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম পাওয়ার পর প্রিয়নবী সেই যায়িদকেই আবার পাঠালেন যায়নাবের কাছে। ততদিনে অবশ্য যায়নাবের ইদ্দতকালীন সময় শেষ হয়ে গেছে। যায়িদ এবার গেলেন বর হিসেবে নয়, ঘটক হিসেবে। যায়িদ যখন তাঁর কাছে গেলেন, তখন তিনি আটা চটকাচ্ছেন।

www.pathagar.com

যায়িদ বলেনঃ তাঁর দিকে তাকাতেই আমার মনে তাঁর সম্পর্কে এক বড় ধরণের সম্মান বোধ সৃষ্টি হল। আমি তার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস হারিয়ে ফেলি। কেননা, প্রিয়নবী তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। আমি একটু পিছু হটে আসি।

সবশেষে যায়িদ বললেনঃ যায়নাব! আমি আপনার কাছে রাসুলুল্লাহর (সাঃ) প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

যায়নাব (রাঃ) জবাব দিলেনঃ 'এখন আমি কাজ করছি। আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা ছাড়া কিছু বলতে পারব না।' এ কথা বলে তিনি মসজিদের দিকে রওনা দিলেন।

ওদিকে আল্লাহতাআলা প্রিয়নবীর উপর নাযিল করলেনঃ

"তারপর যায়িদ যখন যায়নবকে তালাক দিল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম, যেন মুমিনদের পালিত ছেলেরা স্ত্রীদের তালাক দিলে, সেইসব মহিলাদেরকে বিয়ে করায় মুমিনদের কোন বাঁধা না থাকে। আল্লাহর আদেশ তো কার্যকরী হতেই হবে।" (আহযাবঃ ৩৭)

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহতাআলা নবী (সাঃ)-কে যায়নাবের সাথে বিয়ে দিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই যায়নাব প্রিয়নবীর স্ত্রী হয়ে গেলেন। যায়নাবের মতের আর কোন প্রয়োজন রইল না। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কোন অনুমতি ছাড়াই নবীজী যায়নাবের কাছে হাজির হলেন।

এ কারণে পরবর্তীতে যায়নাব প্রিয়নবীর অন্য স্ত্রীদের সাথে গর্ব করে বলতেনঃ আপনাদের বিয়ে আপনাদের অভিভাবকগণ দিয়েছেন, আর আমার বিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা।

অবশ্য পরবর্তীতে যায়নাবের (রাঃ) ভাই আবু আহমাদ (রাঃ) বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা করেছিলেন। এ বিয়েতে জাঁকালো বৌভাতের আয়োজন করেছিলেন আল্লাহর নবী। সে অনুষ্ঠানে নবীজী অতিথিদের সবাইকে রুটি ও গোশত খাওয়ান।

যে নবীর পরিবারের লোকেরা শুধু দুধ খেয়েই দিন কাটাত, সে পরিবারে তিনশো লোককে দাওয়াত করে গোশত-রুটি খাওয়ানো তো জমকালো ঘটনা বটেই। যায়নাব এ বৌভাতকে নিয়েও ছিলেন গর্বিতা। তিনি বলতেনঃ কেবল আমার বিয়েতেই রাসুল (সাঃ) গোশত-রুটি দিয়ে ওলীমা করেছিলেন।

এই খাওয়ানোর মধ্যেও রয়েছে আল্লাহর নিআমত। বিয়ে উপলক্ষে আনাস (রাঃ)-এর সম্মানিতা মা উম্মু সুলাইম (রাঃ) কিছু খাবার পাঠালেন প্রিয়নবীর বাড়িতে। সম্পর্কে উম্মু সুলাইম প্রিয়নবীর খালা হতেন। খাবার পাঠানোর সময় ছেলে আনাসকে বললেনঃ এটা রাসূল (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে যেয়ে বলবে, আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য হাদিয়া।

www.pathagar.com

আনাস (রাঃ) বলেনঃ সে সময় মদীনাবাসীরা দারুণ খাবারের কষ্টে ছিল। আমি খাবারের পাত্রটি নিয়ে যেয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা উম্মু সুলাইম আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, এ হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য হাদিয়া।

রাসূল (সাঃ) পাত্রটির দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'ওটা ঘরের এক কোণে রাখ এবং অমুক অমুককে ডেকে আন।' তিনি অনেক লোকের নাম বললেন। আরও বললেনঃ 'পথে যে মুসলমানের সাথে দেখা হবে, সাথে নিয়ে আসবে।'

আনাস (রাঃ) বলেনঃ যাদের নাম তিনি বললেন, তাদেরকে তো দাওয়াত দিলাম। আর পথে আমার সাথে যে মুসলমানদের দেখা হলো তাদেরও দাওয়াত দিলাম। আমি ফিরে এসে দেখি, রাসূল (সাঃ)-এর পুরো বাড়ি, সুফফা ও হুজরা- সবই লোকে লোকারণ্য।

আনাস (রাঃ)-এর ধারণা অনুযায়ী সেখানে প্রায় তিনশো লোক হাজির হয়েছিলেন। ফিরে এলে আনাসকে প্রিয়নবী (সাঃ) খাবারের পাত্রটি আনতে বললেন। তিনি তা নিয়ে এলেন। প্রিয়নবী সেই পাত্রের উপর হাত রেখে দু'আ করলেন। তারপর বললেনঃ তোমরা দশ দশজন করে বসবে, বিসমিল্লাহ বলবে এবং প্রত্যেকে নিজের পাশ থেকে খাবে।

রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশমত সবাই পেট ভরে খেলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হলে তিনি আনাসকে বললেনঃ পাত্রটি উঠাও।

আনাস বলেনঃ আমি এগিয়ে এসে পাত্রটি উঠালাম। তারমধ্যে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু আমি বলতে পারবো না, যখন রেখেছিলাম তখন বেশী ছিল, না যখন উঠালাম।

এভাবেই শেষ হল প্রিয়নবী (সাঃ)-এর সবচেয়ে জমকালো বৌভাত অনুষ্ঠান। যায়নাব (রাঃ)-এর সাথে বিয়ে নিয়ে মুনাফিক ও কাফিররা অনেক কথাই বলে থাকে। কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে, এ বিয়ের নির্দেশদাতা স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। এ বিয়ের বৌভাতে পর্যন্ত আল্লাহ বরকত দিয়ে বিশাল আয়োজন করিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়নবীকে দিয়ে।

(আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৫ম খন্ড)

এ ঘটনা থেকে জানা যায়, প্রিয়নবীর জীবনের কোন বৌভাতই এর চেয়ে আনন্দঘণ হয়নি। তাই বৌভাত নিয়ে আজকের দিনে যে মাতামাতি হয়, তা-কি আদৌ শরীয়ত সম্মত?

www.pathagar.com

কূফা নগরী

আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একটি জনপ্রিয় বিষয় হল নগর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য গবেষণা। আজ থেকে মাত্র কয়েক বছর আগেও বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশে কেউ ভাবেনি। আর একশ' বছর আগেও ইউরোপ-আমেরিকাতে এ ধরণের বিষয় পড়ানো হত না।

কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাবা যায়, আজ থেকে পনেরশ' বছর আগের একজন সাধারণ আরব উমার (রাঃ) একজন নগর পরিকল্পনাবিদ ছিলেন! তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরের কথা, কোন স্কুল-মাদ্রাসায়ও কোনদিন পড়াশোনা করেননি। অথচ তিনি যে পরিকল্পনায় বিভিন্ন নগরী গড়ে তুলেছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের (রাঃ) নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী ইরানের রাজধানী মাদায়েন বিজয় করলেন। এরপর সা'দ (রাঃ)-ই হলেন সেখানকার গভর্ণর। কিছুদিন পর তিনি খলীফা উমার (রাঃ)-এর কাছে এই বলে সংবাদ পাঠালেন যে, মাদায়েনে বসবাসের কারণে আরবদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা হচ্ছে।

বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করল খলীফার। তিনি সা'দকে লিখলেনঃ মাদায়েনের পরিবেশ আরবদের উপযোগী নয়। তাই এমন একটি স্থান খুঁজে বের কর, যেখানে জলপথ ও স্থলপথ উভয়েরই সুবিধা পাওয়া যাবে।

এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ও হুযায়ফাহ (রাঃ)-কে দায়িত্ব দেয়া হল নতুন জায়গা নির্বাচনের। তাঁরা মাটির প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, নদীর অবস্থান ইত্যাদি দেখে শুনে বর্তমানে যেখানে কূফা নগরী অবস্থিত, সেই জায়গাটি পছন্দ করলেন।

এই জায়গাটির মাটি ছিল বালিমাটি ও কঙ্কর মেশানো। এজন্য এ জায়গাটির নামকরণ করা হয় 'কূফা'। এর কাছেই দু'টি প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ছিল। জায়গাটি ছিল ইউফ্রেটিস নদী থেকে দেড়-দু'মাইল দূরে। জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল খুবই চমৎকার। এখানে পাওয়া যেত সুন্দর সুন্দর সব আরবী ফুল। তাই আরবরা এ এলাকার নাম দিয়েছিল 'খাদ্‌দুল আযরা' বা প্রেয়সীর গণ্ড (চোয়াল)।

হিজরী ১৭ সালে খলীফা উমার (রাঃ)-এর নির্দেশ ও ডিজাইন অনুযায়ী চল্লিশ হাজার পরিবারের বসতি উপযোগী করে এই নগরীর ভিত্তি

www.pathagar.com

স্থাপিত হয়। প্রত্যেক গোত্রের জন্য আলাদা আলাদা মহল্লা বরাদ্দ করা হল। 'হাইয়াজ' নামক এক ব্যক্তি ছিলেন এ কাজের দায়িত্বশীল।

বর্তমান সময়ের বড় শহরের এভিনিউ-এর মতই শহরের প্রধান সড়কটি ছিল ৭২ ফুট চওড়া। মহল্লা সংযোগকারী বড় রাস্তাগুলো ছিল ৫৪ ফুট চওড়া। এর চেয়ে সরু রাস্তাগুলি ছিল ৩০ ফুট চওড়া আর একেবারে চিপা গলিগুলোও ছিল ১২ ফুট চওড়া।

শহরের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদটি ছিল একটি চার কোনা বিশাল ভিটির উপর প্রতিষ্ঠিত। মসজিদটি এত বড় ছিল যে, ৪০,০০০ লোক আরামের সাথে সেখানে সালাত আদায় করতে পারত। মসজিদের চারিদিকে ছিল প্রচুর জায়গা নিয়ে বারান্দা।

মসজিদের সামনে ৩৮০ ফুট দীর্ঘ এক বিশাল চত্বর বানানো হল। এ চত্তরে বসানো হয়েছিল 'রোখাম' নামক একপ্রকার অতিমূল্যবান পাথর। এগুলো আনা হয়েছিল মাদায়েনের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ থেকে। রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী এই রাজপ্রাসাদের কোন মালিক ছিল না। কিন্তু তারপরেও খলীফা মাদায়েনের জিম্মিদের ডেকে চত্তরে ব্যবহৃত পাথরের একটি আনুমানিক মূল্য জেনে নিলেন। এ মূল্য পরিমাণ অর্থ তিনি ঐ এলাকার জিম্মি নাগরিকদের জিযিয়া থেকে কমিয়ে দেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি।

এ ব্যাপারে সম্ভবত খলীফার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, ইরানের অত্যাচারী রাজারা এসব নিরীহ প্রজাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে। আর সেই অর্থ দিয়ে তৈরী হয়েছিল এ রাজপ্রাসাদ। তাই এ রাজপ্রাসাদের প্রকৃত মালিক আসলে এখানকার সাধারণ লোকেরাই।

কেন্দ্রীয় মসজিদ ছাড়াও প্রতিটি মহল্লায় ছিল আলাদা আলাদা মসজিদ। কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে ৩৮০ ফুট দূরে তৈরী করা হল খেলাফতের প্রশাসনিক ভবন। তার পাশেই তৈরী হল বায়তুল মাল বা বর্তমান সময়ের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর কাছেই ছিল সরকারী মেহমানখানা। বাইরে থেকে মুসাফিররা এসে এখানে আশ্রয় নিতেন। তাদের থাকা-খাওয়ার যাবতীয় খরচ বহন করত বায়তুল মাল।

নব নির্মিত এই শহরের বাড়িগুলি তৈরী হয়েছিল বাশ-ঘাস ইত্যাদি দিয়ে। কিন্তু একবার আগুন লেগে প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেল নগরবাসীদের। এরপর খলীফার নির্দেশে ইট-পাথরের বাড়ি গড়ে তোলা হল।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন বায়তুল মাল ভাণ্ডারে চুরি হল। সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছানো হল মদীনায় খলীফার কাছে। তিনি বায়তুল মাল ভবনকে মসজিদের সাথে জুড়ে দেয়ার নির্দেশ পাঠালেন। এ জন্য দায়িত্ব

www.pathagar.com

দেয়া হল ইরানী ইঞ্জিনিয়ার রোজবেহকে। তিনি বায়তুল মাল ভবনকে সম্প্রসারিত করে মসজিদের সাথে মিলিয়ে দেন।

এ কাজটি গভর্ণর সা'দ (রাঃ)-এর এত পছন্দ হল যে, তিনি রোজবেহকে মদীনায় খলীফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। খলীফা এই ইরানী ইঞ্জিনিয়ার ও তার সাথীদেরকে প্রচুর পরিমাণে আপ্যায়ন করেন এবং তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে বাকী জীবনের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন।

এ বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, একটি নতুন নগরী গড়ে তুলতে কতটা মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছিলেন খলীফা উমার (রাঃ)। তাঁর নিজ পরিকল্পনায় গড়ে ওঠা এই শহরটি এত সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ ছিল যে, কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে সেখানে বসতি গড়ে তুলল।

এ নগরী হযরত উমারের আমলেই এত উন্নতি লাভ করে যে, তিনি 'কূফা' নগরীকে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র বলে আখ্যায়িত করতেন। আসলে এ নগরীটি আরবজাতির শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

'কূফা' ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চারও এক চমৎকার কেন্দ্র ছিল। মুসলিম রাজনীতিতেও 'কূফা' অনেক ভূমিকা রেখেছে। কালের আবর্তনে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়ে গেল। শত শত বছর পরেও উমার (রাঃ)-এর এই শহরের ইমারতগুলি কালের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা হিজরী আটশ সালেও সেখানকার প্রশাসনিক ভবনের ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন।

হযরত উমার (রাঃ) শুধুমাত্র একজন খলীফা নন, তিনি ছিলেন অসামান্য মেধাবী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তার সেই মেধা-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে আজও কূফা নগরী। বর্তমানে এই নগরীটি ইরাকের অন্তর্ভূক্ত।

তথ্যসূত্রঃ

১। আল ফারূক- আল্লামা শিবলী নোমানী
২। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস- ইফাবা প্রকাশনাঃ ১৮৬৩

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের জবাব

ইহুদীরা ছিল মুসলমানদের জাত দুশমন। সুযোগ পেলেই তারা মুসলমানদের কিভাবে ক্ষতি করা যায়, এ চিন্তায় লেগে যেত। কিন্তু ওরা বীর যোদ্ধা ছিল না। তবে ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে বর্তমান সময়ের মত তখনও ইহুদীরা ছিল বিশ্বসেরা। এ কারণে তারা যুদ্ধের বদলে ঘৃণা ও শত্রুতার বিষবাষ্প ছড়াত।

তাদের সাথে মুসলমানদের সুস্পষ্ট চুক্তি ও ওয়াদা ছিল। কিন্তু তারপরও মুসলমানদের সাথে গোলমাল বাঁধানোর চেষ্টায় তাদের কোন কমতি ছিল না। ওরা নিজেদের কাজের জন্য কয়েকবার শাস্তি পেয়েছে। যেমন, ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকাকে মদীনা ছেড়ে বিদায় নিতে হয়েছে (১২শ' খন্ডের ৩য় কাহিনী)। ওদের শ্রেষ্ঠ কবি কা'ব বিন আশরাফকে (৮ম খন্ডের ৫ম কাহিনী) হারাতে হয়েছে।

এসব ঘটনার পর কিছুদিন পর্যন্ত ওরা চুপচাপ ছিল। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের পর আবার ওরা নতুন উদ্যমে ষড়যন্ত্র পাকাতে আরম্ভ করে। এবার আর চুপে চুপে নয়, প্রকাশ্যে। জোট গঠন করল ওরা মদীনার মোনাফেক ও মুশরিকদের সাথে।

এসব খবর সময়মত পৌঁছে যেত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। তিনি সবকিছু জেনেও ধৈর্য ধারণ করেন। এরই মধ্যে ঘটে রাজিঈ (৪র্থ খন্ডের ১৪শ' কাহিনী) ও বীরে মাউনার দুর্ঘটনা। এসব ঘটনার পর ইহুদীদের সাহস বেড়ে গেল বহুগুণ। তারা এবার নবীজীকেই খুন করার দুঃসাহসী পরিকল্পনা নিয়ে বসল।

ঘটনাটি এরকমঃ প্রিয়নবী (সাঃ) আবুবকর, উমার, আলী (রাঃ)-সহ কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে হাজির হলেন ইহুদীদের বনু নাযির গোত্রের এলাকায়। উদ্দেশ্য মুসলমানদের হাতে ভুলক্রমে নিহত দুই ব্যক্তির রক্তমূল্য নিয়ে আলোচনা। ইহুদীদের সাথে চুক্তি ছিল যে, হত্যার কারণে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে তারা মুসলমানদেরকে সহায়তা করবে।

প্রিয়নবী ইহুদীদেরকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারা বললঃ হে আবুল কাসেম! আমরা তাই করব। আপনি আপনার সাথীদের নিয়ে এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমরা ব্যবস্থা করছি।

এরপর প্রিয়নবী (সাঃ) ইহুদীদের একটি দেয়ালের পাশে হেলান দিয়ে বসে অপেক্ষায় থাকলেন।

www.pathagar.com

ওদিকে ইহুদীরা একটু দূরে সরে গেল। ঠিক তখনই তাদের কাঁধে শয়তান সওয়ার হল। তাদের দিকে ধেয়ে আসা বিপদকে শয়তান সৌভাগ্য হিসেবে দেখাল। ইহুদীরা নিজেরা পরামর্শ করলোঃ এই তো চমৎকার সুযোগ, চলো আমরা মুহাম্মাদকে প্রাণে মেরে ফেলি। দেয়ালের ওপার থেকে একটি ভারী চাক্কি (পাথর) ফেলে মুহাম্মাদকে খুন করতে কে রাজী আছ?

আমর ইবনে জাহাশ নামক এক ইহুদী রাজী হল এ অপকর্ম করার জন্য। কিন্তু আরেক ইহুদী সালাম ইবনে মাশকাম বললঃ সাবধান, এমন কাজও কর না। আল্লাহর কসম, তোমার ইচ্ছার খবর আল্লাহর রাসূল ঠিকই জেনে যাবেন। আল্লাহতায়ালাই তাঁকে এ খবর দিয়ে দেবেন। আর মুসলমানদের সাথে আমাদের যে চুক্তি রয়েছে, তাও ভেঙ্গে ফেলা হবে।

কিন্তু দুর্ভাগা ইহুদীরা এসব কথা কানেই তুলল না। ওরা পরিকল্পনা মত কাজে লেগে গেল।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা অন্য রকম। তিনি জিবরাঈলকে ইহুদীদের চক্রান্তের খবর জানিয়ে দেয়ার জন্য প্রিয়নবীর কাছে পাঠালেন।

খবর পেয়ে প্রিয়নবী সাথে সাথে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। সাহাবীরা কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁরা তো বলেই ফেললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এতো তাড়াতাড়ি চলে এলেন যে, আমরা কিছু বুঝতেই পারলাম না।

এরপর রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে ইহুদীদের চক্রান্তের কথা খুলে বললেন।

মদীনা ফিরেই রাসূল (সাঃ) মুহাম্মাদ ইবন মাসলামাকে বনু নাযিরের এলাকায় এ নোটিশ দিয়ে পাঠালেন যে, তোমরা অবিলম্বে মদীনা ছেড়ে বেরিয়ে যাও। এখানে তোমরা আমাদের সাথে থাকতে পারবে না। তোমাদের দশ দিনের সময় দেয়া হল। এরপর যাদের পাওয়া যাবে তাদের হত্যা করা হবে।

এ নোটিশ পাওয়ার পর মদীনা ছেড়ে বের হওয়ার আর কোন বিকল্প রইল না। সফরের প্রস্তুতি নিতে লাগল বনু নাযিরের চক্রান্তকারী ইহুদীরা।

বিগত দিনের মত এবারও তাদের পাশে এসে দাঁড়াল মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে খবর পাঠালোঃ তোমরা নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও। বাড়িঘর ছেড়ে যেও না। আমার দু'হাজার যোদ্ধা রয়েছে, যারা সাহায্যের জন্য তোমাদের দূর্গে ঢুকবে। এরা তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা দেবে। তবুও যদি বের করে দেয়া হয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব।

www.pathagar.com

সে আরো বলে পাঠালোঃ তোমাদের ব্যাপারে কারো হুমকিতে আমরা সরে আসব না। যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, তবে আমরা তোমাদের পাশে দাঁড়াবো। বনু কুরায়যা ও বনু গাতফান গোত্রের লোকেরাও তোমাদের সাহায্য করবে।

ইহুদীরা মুনাফিক সর্দারের কথাকে খাঁটি ওয়াদা মনে করে চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারা মুনাফিক ও অন্যদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিল। এমনকি তাদের সর্দার হুয়াই ইবনে আখতার আল্লাহর রাসূলের কাছে এ খবরও পাঠাল যে, আমরা বাড়িঘর ছেড়ে নড়ব না।

মুসলমানদের জন্য এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা কোন সহজ ব্যাপার ছিল না। মদীনার বাইরে মুসলমানদের অগণিত দুশমন। এরই মধ্যে যদি আবার মদীনার ভিতরেও যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহলে তো পরিস্থিতি আরো কঠিন হয়ে পড়বে। আর ইহুদী-মোনাফিকদের সম্মিলিত জোটের শক্তিও কম নয়। বনু নাযিরের যোদ্ধারাও তো মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করবে।

এসব ঘটনার কারণে মুসলমানরা যেমন ছিলেন চিন্তিত, তেমনি বিরক্তও। সবদিক ভেবে মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নিলেন, যারা প্রিয়নবীকে হত্যার মত চক্রান্ত করতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোন বিকল্প নেই। যুদ্ধ হবেই।

ইহুদী সর্দারের ঘোষণা আসার সাথে সাথেই প্রিয়নবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মদীনার দায়িত্ব এক সাহাবীর হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি বনু নাযিরের মহল্লার দিকে যুদ্ধযাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে অবরোধ করলেন গোটা মহল্লা।

বনু নাযির অবস্থা খারাপ দেখে, আশ্রয় নিল নিজেদের দুর্গে। সেখান থেকে তারা তীর ও পাথর ছুড়তে লাগল। সেখানে ছিল ঘণ খেজুর বাগান। ওরা এ গাছগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছিল।

এ দেখে আল্লাহর রাসূল আদেশ দিলেন যে, ওসব গাছ কেটে পুড়িয়ে দাও। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ নাযিল করলেনঃ

"তোমরা খেজুর গাছগুলো কেটেছো এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সে তো আল্লাহর অনুমতি ক্রমেই। এটা এজন্যই যে যারা পাপী, তাদের আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন।" (সূরা হাশরঃ ৫)

বিপদ যখন বনু নাযিরের ঘাড়ের উপর, তখন বন্ধু বনু কুরায়যা তাদের ধারে কাছেও এল না। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহও ভুলে গেল ওয়াদার কথা। ভুলে গেল বনু গাতফানও। সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল বনু নাযির।

আল্লাহতায়ালা এসব গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতার তুলনা দিয়েছেন এভাবেঃ এদের তুলনা শয়তান, যে মানুষকে বলে, কুফরী করো। তারপর যখন সে

www.pathagar.com

কুফরী করে, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি জগতসমূহের প্রভূ আল্লাহকে ভয় করি।" (সূরা হাশরঃ ১৬)

অবরোধ চলল বেশ কয়েকদিন। এরই মধ্যে পরিস্থিতি দেখে ইহুদীদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। ওদের মনে আল্লাহ ভয় ধরিয়ে দিলেন। ওরা অস্ত্র সমর্পণ করে মদীনা থেকে বেরিয়ে যেতে রাজী হয়ে গেল।

প্রিয়নবীর কাছে বলে পাঠালঃ আমরা মদীনা ছেড়ে চলে যেতে তৈরী।

প্রিয়নবী (সাঃ) ওদের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। সাথে সাথে এও বলে দিলেনঃ অস্ত্র ছাড়া অন্যান্য সম্পদ যতোটা সম্ভব নিয়ে যেতে পারবে ও সপরিবারে মদীনা ছেড়ে যেতে হবে।

এরপর ইহুদীরা নিজ হাতে ঘর দোর ভেঙ্গে বাঁধতে শুরু করল। এমনকি দরজা, জানালা যতোটা সম্ভব ভেঙ্গে নিয়ে গেল ওরা। কেউ কেউ ছাদের কড়া, দেয়ালের খুটিও তুলে নিয়ে গেল। এরপর নারী-শিশুদের উটের পিঠে উঠিয়ে মদীনা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

একদল ইহুদী গেল সিরিয়ার দিকে। আর অধিকাংশই গেল খয়বারের দিকে। এতকিছুর মধ্যেও দু'জন ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুজাহিদরা তাদের সম্পদ ছুঁয়েও দেখেননি।

বনু নাযিরের কাছ থেকে ফাঈ বা বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ হিসেবে পাওয়া গেল অনেক কিছু। এর মধ্যে ছিল প্রচুর অস্ত্র। এছাড়াও ছিল তাদের বাগান, বাড়ি, জমি। আর এর সবই ছিল প্রিয়নবীর মালিকানায়।

এসব সম্পদ তিনি বিলিয়ে দিলেন প্রথম পর্যায়ে হিজরতকারী সাহাবীদের। আর দিলেন দু'জন দরিদ্র আনসার সাহাবীদেরকে। আর কিছু সম্পদ রাখলেন নিজের জন্য।

এভাবেই সমাপ্তি ঘটল মদীনার আরও একটি ইহুদী গোত্রের চক্রান্তের। আসলে ইহুদীরা জাত চক্রান্তকারী। খায়বারে গিয়েও ওরা নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছে। সেখান থেকেও আল্লাহর রাসূল তাদের উচ্ছেদ করেছেন।

(আসহাবে রাসূলের জীবনকথা)

ইহুদীরা যেখানেই গেছে, সেখানেই চক্রান্ত করেছে। ফলে ১৯৪৭-এর আগ পর্যন্ত ওদেরকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। আজ ওরা ইসরাঈলে স্থায়ী হওয়ার চেষ্টা করছে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। সমূলে ধ্বংস হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত ওরা ষড়যন্ত্র করতেই থাকবে। তাই ওদের বিরুদ্ধে প্রিয়নবী আর সাহাবীদের মত আমাদেরকেও সজাগ-সচেতন থাকতে হবে।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত আরও কয়েকটি বই

১। যে অতীত প্রেরণা যোগায়
২। জিযিয়া
৩। জান্নাতের পালঙ্ক
৪। উহুদের শহীদ মুসয়াব (রাঃ)
৫। ছোট্ট পাখির অভিযান
৬। যমযম কূপ
৭। আবু লাহাব ও সূরা আল লাহাব
৮। দুর্গম পথে দুঃসাহসী খালিদ (রাঃ)
৯। অপারেশন দুমাতুল জান্দাল
১০। জীবন্ত শহীদ তালহা (রাঃ)
১১। ইরান জয়ের গল্প
১২। চার শহীদের মা
১৩। আট শহীদের বাবা
১৪। হাদীসের আলো- ১ম খন্ড
১৫। হাদীসের আলো- ২য় খন্ড
১৬। হাদীসের আলো- ৩য় খন্ড
১৭। যে অতীত প্রেরণা যোগায়- ১ম ভলিউম
১৫। যে অতীত প্রেরণা যোগায়- ২য় ভলিউম (প্রকাশিতব্য)
১৬। মৃত্যুদন্ড (প্রকাশিতব্য)